চাঁদমামা
অক্টোবর ১৯৭৩
৭০ P

Photo by: T. SURYANARAYANA

পেটের গোলমাল?
সে আবার কি বাপু?
কোনদিন শুনিনিতো!
ডাবর
গ্রাইপ
ওয়াটার
প্রত্যেক মায়ের কাছে
তার শিশুর মতন প্রিয়
শিশুদের বদহজম, অম্বল, পেটব্যাথা, বায়ু, ও দাঁতউঠার সময় ব্যাথার একটি সুস্বাদু সুনিশ্চিত সমাধান
GRIPE
WATER
ডাবর (ডাঃ এস. কে. বর্ম্মন) প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-২৯

everest/547/PP ben

চাঁদমামা
সংস্থাপক : বি. নাগি রেড্ডি
নিয়ন্ত্রণ : চক্রপাণি
এবারের বেতাল কথার নাম 'প্রদর্শনী।' যে কোন কাজের জন্য যোগ্য লোক নির্বাচন করা সহজ নয়। এই কাহিনীতে রাজার অঙ্গরক্ষক বাছাই করতে এক অপূর্ব পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। দীর্ঘ দিন মনে রাখার মত এক কৌশলের সন্ধান পাবেন।
বিশেষ ক্ষেত্রে ইচ্ছে করলে যে কোন লোক বুদ্ধি খাটিয়ে সাধারণ মানুষের উপকার করতে পারে তার উদাহরণ পাব 'চোর' ও 'বিচিত্র ভেট' পড়ে। এছাড়া চলছে যক্ষপর্বত, মহাভারত ও মিত্রভেদ।
খণ্ড ২ অক্টোবর ১৯৭৩ সংখ্যা ৪
CP
CHITRA

যাঞ্চা মোঘা বর মধিগুণে
না ধমে লব্ধকামা। ॥ ১ ॥

[অধম ব্যক্তির কাছে কিছু চেয়ে পাওয়ার চেয়ে গুণবানের কাছে বর চেয়ে না পাওয়া ভাল।]

স্বজনস্য হি দুঃখমগ্রতো
বিবৃতদ্বার মি বোপজায়তে। ॥ ২ ॥

[যারা দুঃখী আপনজনকে দেখলে যেন তাদের দুঃখ গুমরে ওঠে।]

বিষমস্য মৃতং ক্বচিদ্ভবেৎ,
অমৃতম্ বা বিষমীশ্বরেচ্ছায়া। ॥ ৩ ॥

[ঈশ্বরের ইচ্ছায় অমৃত একজনের কাছে বিষের সমান লাগে, আবার বিষ অন্যজনের কাছে অমৃতের মত লাগে।]

কস্তে কান্তম্ সুখমুপনতম্
দুঃখ মে কান্ততো বা,
নীচৈর্গচ্ছ ত্যুপরিচদশা
চক্রনেমি ক্রমেণ। ॥ ৪ ॥

[কারও জীবনেই দুঃখ অথবা সুখ চিরকাল থাকে না। মানুষের জীবনে উত্থান ও পতন চক্রের মত আসে যায়।]

কালিদাসের উক্তি
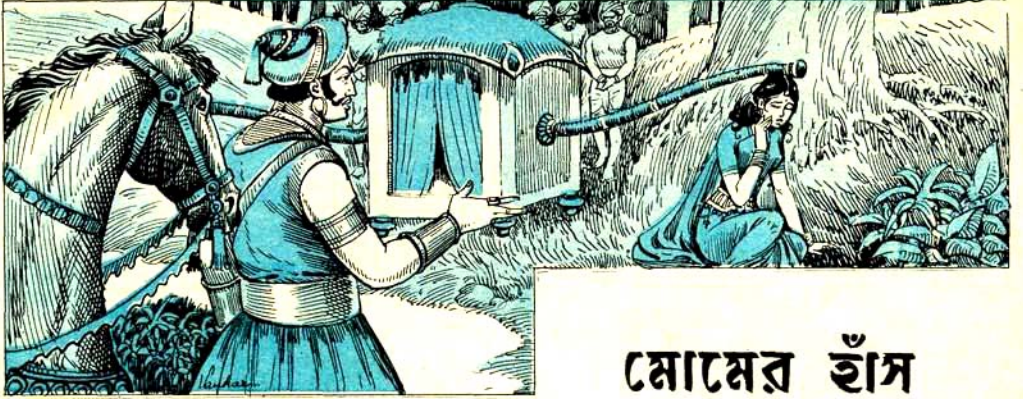
মোমের হাঁস

রাজগড়ের রাজা দেবপাল শিকার সেরে ফেরার পথে তার সঙ্গে এল এক অপরূপা সুন্দরী পাল্‌কী করে। ছজন লোক তাকে বয়ে আনল পাল্‌কীতে।

ঘন বনে একটি বড় গাছের নিচে বসে রূপবতী কাঁদছিল। রাজা তাকে ঐভাবে কাঁদতে দেখে তার কাছে গিয়ে প্রশ্ন করল, "কে তুমি? কোত্থেকে আসছ?"

আমি এক রাজকুমারী। আমার বাবা ও মাকে এক রাক্ষসী হত্যা করেছে। সেই আমাকে এখানে রেখে গেছে।" ডুকরে ডুকরে কাঁদতে কাঁদতে সে বলল।

রাজার তার অবস্থার কথা শুনে দুঃখ হল। বলল, "তাহলে এখন তুমি কি করবে? এখানে থাকবে? ইচ্ছে করলে তুমি আমার সঙ্গেও আসতে পার। তোমার বিয়ে না হয়ে থাকলে আমি বিয়ে করে রাণী হিসেবে রাজমহলে রাখতেও পারি।"

"একটি সর্তে আপনার প্রস্তাব মানব, যা করতে চাইব তা করতে দিতে হবে। বাধা দিতে পারবেন না।" তরুণী বলল্।

রাজা তার রূপে মুগ্ধ হয়ে সঙ্গে সঙ্গে তার প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেল। কালমাত্র বিলম্ব না করে সেখানেই তাকে বিয়ে করে ফেলল। তারপর তাকে পাল্‌কিতে বসিয়ে নতুন রাণীকে প্রাসাদে নিয়ে এল। নতুন রাণীর নাম দিল মোহিনী।

দেব পালের প্রথম পক্ষের রাণী আছে। তার নাম রূপরাণী। রূপরাণীকে বিয়ে করার পর দশ বছর কেটে গেছে। কিন্তু তার কোন সন্তান হয়নি। সেইজন্য রাজা আগে থেকেই আর একটি বিয়ে করবে স্থির করেছিল।

এ. সি. সরকার (জাদুকর)

নতুন রাণীকে আনার পর রূপরাণী খুব দুঃখ পেল। সন্তান প্রাপ্তির জন্য সে শিবের আরাধনা করল। পরে সে গর্ভবতী হল। তা জেনে দেবপাল খুব খুশী হল।

এই খুশী হওয়ার খবর পেয়ে মোহিনীর খুব রাগ ধরল। রূপরাণী মোহিনীকে যতই বোনের মত দেখুক না কেন মোহিনী ঠিক করল রূপরাণীর ক্ষতি করবে। অপর পক্ষে রূপরাণী কিন্তু মোহিনীকে স্নেহে সমাদর করত।

রূপরাণীর প্রসবকাল এগিয়ে এল। যত দিন যায় মোহিনীর ঈর্ষা তত বাড়ে। কিন্তু আচরণে বা কথাবার্তায় সে তা প্রকাশ করেনি। রূপরাণী কোনদিন কল্পনাও করতে পারেনি যে মোহিনী তাকে ঈর্ষা করে। ঘৃণা পোষণ করে।

মোহিনী একদিন রাজাকে বলল, "আমার দিদির প্রসবের সময় আমি একাই থাকব। আমিই দাইয়ের কাজ করব। আমি পারব।"

"বেশতো তুমি একা যদি সামাল দিতে পার দেবে। আমার কোন আপত্তি নেই। তবে আমার পরিবারের দাই আছে। ইচ্ছে করলে সাহায্য নিতে পার।" রাজা বলল।

"দিদির জন্য ওটুকু করতে পারব না! কী যে ভাবেন আমার সম্পর্কে। ওটুকু করে আমি আমার দিদির প্রতি ভালবাসা জানাব।" মোহিনী বলল।

রাজা তাতেই রাজী হল। মোহিনী আসলে ছিল এক তান্ত্রিক। মন্ত্রশক্তি বলে সে সুন্দরীর রূপ ধারণ করেছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল রাজাকে নষ্ট করে রাজ্য ধ্বংস করা। রূপরাণী যেহেতু ছিল শিব-ভক্ত সেইহেতু কোন মন্ত্রতন্ত্রই তার উপর ক্রিয়া করতে পারল না।

রাজাকে বুঝিয়ে রাজদরবারের অনেককে হাত করে প্রসবের দিনে একটা ষড়যন্ত্র করার তালে ছিল মোহিনী। সে প্রসবের সময় রূপরাণীর ঘরে ছিল। বলে দিল সন্তান হলে ঘণ্টা বাজিয়ে জানিয়ে দেবে। সুন্দর এক পুত্রসন্তান হল রূপরাণীর। মোহিনী তৎক্ষণাৎ সেই ছেলেকে ঘুম-

খাওয়া লোকের হাতে তুলে দিয়ে গোপনে সেটাকে নিয়ে গিয়ে মাটিতে পুঁতে আসতে বলল। জ্ঞান ছিল না রূপরাণীর। কিছুক্ষণ পরে তার পাশে একটা মোমের হাঁস রেখে ঘণ্টা বাজিয়ে দিল।

তৎক্ষণাৎ ঘরে ঢুকে রূপরাণীর পাশে মোমের হাঁস দেখে রাজা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল।

"মহারাজ আপনার সন্তানকে আদর করুন।" হাঁস দেখিয়ে মোহিনী বলল।

রাজা দেবপাল বিরক্ত হয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল সেখান থেকে। মোহিনী হাসল।

রূপরাণীর প্রতি তার যেটুকু দুর্বলতা জেগেছিল তা যেন হারিয়ে গেল। প্রত্যেক দিন সে রূপরাণীকে জড়িয়ে রাজাকে খোঁটা দিত। শেষে রাজা রূপরাণীকে মায়াবিনী বলে দেশ থেকে বহিষ্কার করল।

বনে একটা ছোট্ট কুটির বানিয়ে শিবের আরাধনা করে কাল যাপন করতে লাগল রূপরাণী।

একদিন এক ঋষি রূপরাণীর কাছে এসে তার হাতে একটা বাচ্চা দিতে দিতে বলল, "মা, এ তোমার ছেলে। তোমার পেটের সন্তান। দ্বিতীয় রাণী ব্যাধের মেয়ে। অনেক মন্ত্র জানে। সেই তোমার এই সন্তানকে গোপনে বের করে দিয়েছিল। ওর লোক এই শিশুকে পুঁতে দিয়েছিল মাটিতে। আমি তা লক্ষ্য করে তৎক্ষণাৎ গর্ত থেকে

বেড়ে গেল। রাজার গজশালা থেকে হাতি ও অশ্বশালা থেকে ঘোড়া একটা একটা করে হারাতে লাগল। গাছে ফুল ফুটল না, ফল ফলল না। ক্ষেতে ফসল হল না। রাজার শরীর দিনকে দিন ভেঙ্গে পড়তে লাগল। অন্য রাজ্যের সঙ্গে বিরোধ বাড়তে লাগল। রাজ্যের মধ্যেও খাদ্যের অভাবে দেশবাসীর মনে রাজার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দানা বাঁধতে লাগল।

একদিন ঐ ঋষি গোপনে ঐ রাজ্যে এসে মহামন্ত্রী দণ্ডপাণির সঙ্গে দেখা করে আলোচনা করল। দণ্ডপাণি তার সঙ্গে যে গোপন আলোচনা করেছিল্ তার উদ্দেশ্য বা কারণ সম্পর্কে মন্ত্রী কাউকে কিছু বলল না।
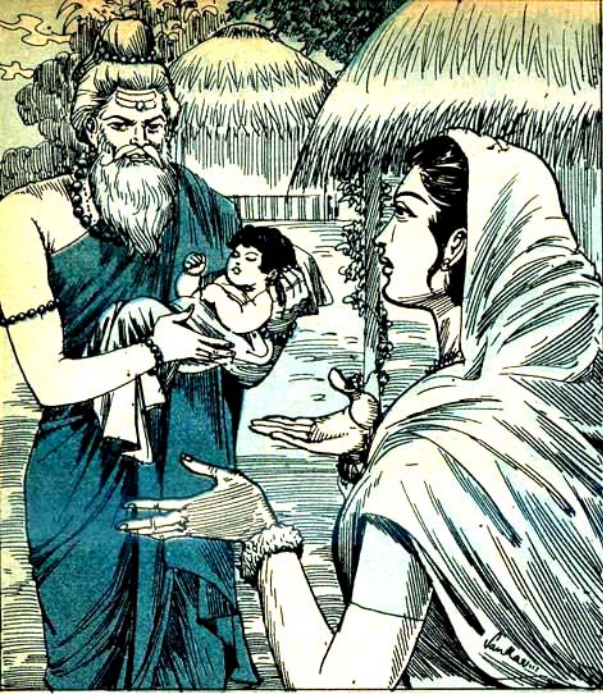
বের করে দিলাম। তোমার সন্তানকে এখন থেকে তুমি লালন পালন কর মা।"

"আমি আপনার উপকারের কথা কোন দিন ভুলব না। আপনার ঋণ শোধ করতে পারব না কোনদিন। আমাকে দয়া করে একটা কাজে সাহায্য করবেন।" হঠাৎ রূপরাণী তাকে প্রশ্ন করল।

"অবশ্যই সাহায্য করব মা। সেটা আমার কর্তব্য। শুধু তাই নয় ঐ তান্ত্রিক মোহিনীকে দেশ থেকে দূর করিয়ে এই পুত্র সন্তানকে রাজ সিংহাসনে বসাতেও আমি বদ্ধ পরিকর।" বলল ঋষি।

রূপরাণী প্রাসাদ থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর থেকে মোহিনীর দাপট অনেকগুণ

ঋষি দণ্ডপাণিকে জানাল যে মোহিনী মানবী নয় রাক্ষসী। রূপরাণী ও রাজার পুত্র সন্তান যে তার হেফাজতে আছে তাও জানাল ঋষি।

তারপর ঋষি তার থলি থেকে একটা মোমের হাঁস, একটা লোহার পেরেক, একটা আটার রুটি ও পাথর বের করল। সেই পেরেক হাঁসের নাকের ভেতর গুঁজে দিল। বাইরের দিকে সামান্য একটু বেরিয়ে ছিল পেরেকের অংশ। আর ঐ পাথরের মত কালো টুকরোটাকে গুঁজে দিল রুটির ভিতরে। পরে ঐ হাঁস ও

রুটি দণ্ডপাণির হাতে দিয়ে গোপনে কি যেন বলে চুপচাপ চলে গেল ঋষি।

পরের দিন দণ্ডপাণি রাজপ্রাসাদের সভায় বলল, "মহারাজ, এখন আমি আপনাকে এক অদ্ভুত ঘটনা দেখাচ্ছি।" একথা বলে দণ্ডপাণি. এক জলের পাত্র কাঠের উপর রেখে ঐ জলে মোমের হাঁসটাকে ছেড়ে দিল। দেবপালকে উদ্দেশ্য করে বলল, "মহারাজ, দেখুন, ভালভাবে লক্ষ্য করুন মহারাজ, এক টুকরো রুটির জন্য এই হাঁস কিভাবে ছোটাছুটি করবে।"

"রাজ্যের মাথা সব বসে আছে। এদের সামনে এই ধরণের অর্থহীন কথা বলার কোন মানে হয় না। প্রাণহীন হাঁস কখনও রুটির জন্য চলাফেরা করতে পারে?" রাজা দেবপাল বলল।

"মানুষের গর্ভে যদি মোমের হাঁস জন্মাতে পারে, প্রাণহীন হাঁস চলতে পারবে না কেন মহারাজ?" দণ্ডপাণি বলল আবার, "তাহলে মহারাজ ভেবে নিতে পারেন যে দুটো ঘটনার মধ্যেই কোন জাদু আছে। মায়ার খেলা।" বলে মন্ত্রী দণ্ডপাণি হাঁসের মুখের কাছে রুটি ধরল। যে দিকে রুটি ধরে সে দিকেই হাঁস তাড়াতাড়ি চলে যায়। সবাই দেখে অবাক হয়।

ঠিক সেই সময় ঋষি রূপরাণী ও দেবপালের পুত্র সন্তানকে নিয়ে এল। ওদের দেখে রাজা চমকে গেল। ঋষি রাজার
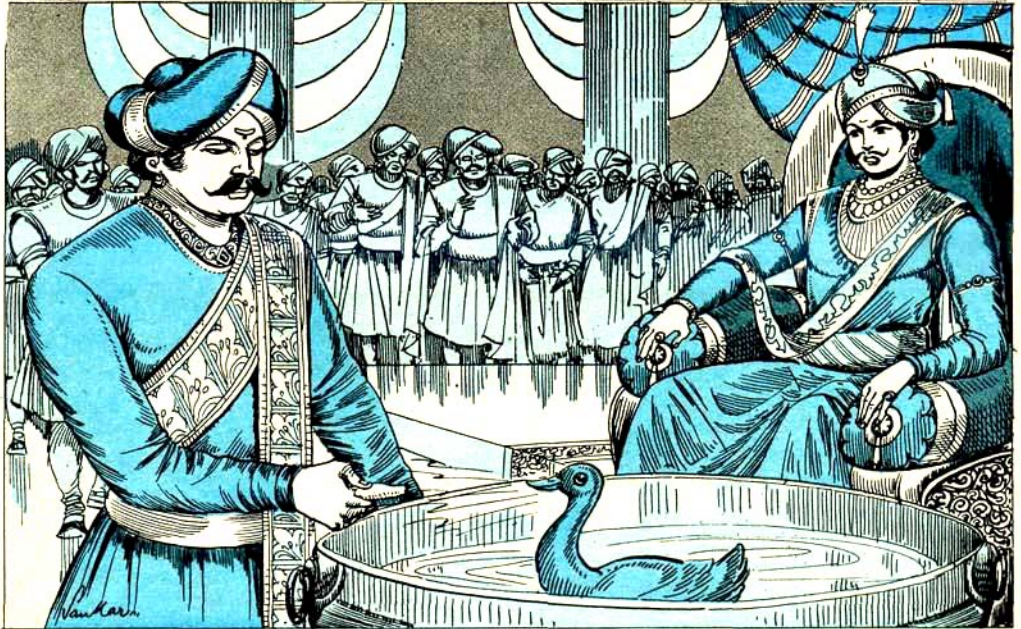
কাছে এসে নিজের দাড়ি খুলে ফেলল। রাজা তাকে দেখে অবাক হয়ে বলল, "গুরুদেব, আপনি! আমি আপনাকে চিনতে পারিনি গুরুদেব।" বলে তার পায়ে প্রণাম করল রাজা দেবপাল।

"আরও অনেক কিছু চিনতে পারনি বৎস। তোমার দ্বিতীয় রাণী যে মায়াবী সেও তোমার অচেনা রয়ে গেল। রূপরাণী যে তোমার সৌভাগ্যলক্ষ্মী তাকেও তুমি চিনতে পারনি। পুতুল-হাঁসটাকেও চিনতে পারনি। ভেবেছ নিজের সন্তান। মোহিনীর আসল রূপও তোমার অচেনা রয়ে গেল। তার আসল রূপ যে কি তা তোমাকে দেখাচ্ছি দেখ।" বলে রাজগুরু কমণ্ডলু থেকে একটু জল বের করে মোহিনীর উপর ছুঁড়ে দিল। তৎক্ষণাৎ মোহিনী কুঁজো হয়ে গেল। তার গায়ে রঙ হয়ে গেল আলকাতরার মত ঘন কাল। আর একবার কমণ্ডলু থেকে জল বের করে সেই কুব্জদেহীর উপর ছুঁড়তেই সে এক মুঠো ছাই হয়ে গেল।

"গুরুদেব আমরা বেঁচে গেলাম।" সমস্বরে সবাই বলে উঠল। রাজাও জোড় হাত করে দাঁড়াল।

রাজগুরু বলল, "তুমি যখন মোহিনীকে এনেছিলে তখনই আমি টের পেয়েছিলাম। তক্ষুনি তোমাকে কিছু বললে তা তুমি গ্রহণ করতে না। অগত্যা আমি শিবের আরাধনা করে মায়াবিনীকে হত্যা করার জন্য এই মন্ত্রজল সংগ্রহ করেছি। আমি তোমার রাণী রূপরাণী ও তোমার পুত্র সন্তানকে সযত্নে রেখেছি। তাদের দেখা-শোনা করেছি।"

রাজা দেবপাল বলল, "কোথায় আমার পুত্র সন্তান? কে আমার পুত্র?"

"ঐতো তোমার পুত্র তোমার স্ত্রীর কোলে।" রাজগুরু দূরে পুত্রসন্তান কোলে দাঁড়িয়ে থাকা রূপরাণীর দিকে দেখাল।
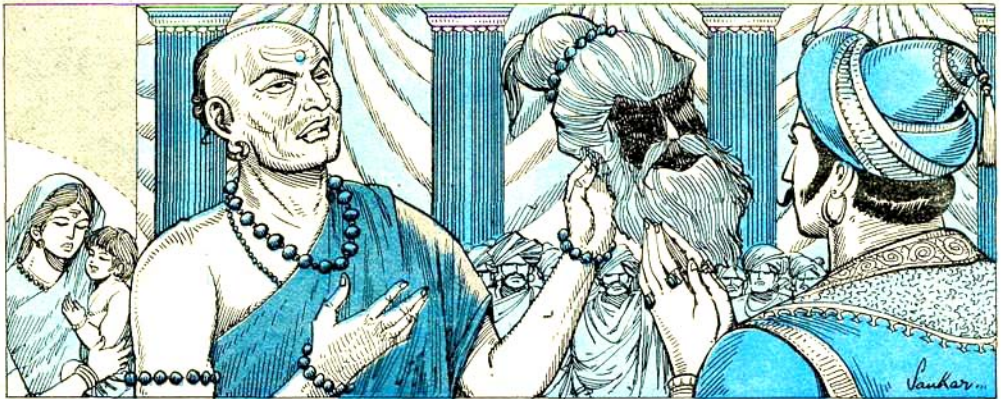
যক্ষপর্বত

পনের

[গুরু-ভালুক সুড়ঙ্গ পথের উপরের দরজার কাছে এল। খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত মরা নেকড়েকে নেকড়েদের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তা দেখে নেকড়েগুলো সুড়ঙ্গে ঝাঁপ দিল। ওদের পেছনে গেল খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত। নীচে সমরবাহু ও তার অনুচরকে নেকড়েগুলো যেন ঘিরে রইল। তারপর···]

সমরবাহু এদিক ওদিক তাকিয়ে সুড়ঙ্গের দুর্গ এড়িয়ে অন্য কোন পথে পালানো যায় কিনা ভাবছে। হঠাৎ তার অনুচর লাফ দিয়ে চিৎকার করে উঠল, "প্রভু, নেকড়েগুলো আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমাদের আর বাঁচার কোন উপায় দেখছি না। চলুন যাই ওই সুড়ঙ্গের দরজায়।"

জীবদত্ত সমরবাহুর দিকে এগিয়ে আসতে দেখল নেকড়েদের। তৎক্ষণাৎ নিজের মন্ত্রদণ্ড নিয়ে তা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নেকড়েদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়ে বলল, "সমরবাহু, যাই ঘটুক না কেন, আমাদের দুর্গে যেতেই হবে। শত্রুকে হটাতেই হবে। তাছাড়া আমাদের মুক্তি নেই। তোমরা দুজনে তাড়াতাড়ি সুড়ঙ্গের দরজার

কাছে চলে যাও। দেরী করো না। দেরী করেছ কি মরেছ।"

ইতিমধ্যে খড়্গবর্মা দরজার ওপার থেকে হাত বাড়িয়ে বলল, "সমরবাহু, চন্দু, তোমরা তাড়াতাড়ি আমার হাত ধরে উপরে উঠে এস।"

সমরবাহু আর তার অনুচর খড়্গবর্মার কথা মত তার হাত ধরে এক লাফে উপরে উঠে গেল। জীবদত্তও ওদের সঙ্গে ওই পথে এগিয়ে গেল।

এখন চারজনে মিলে সুড়ঙ্গ পথে এগোচ্ছে। ওই ঘন অন্ধকারে ওরা সেই মরা নেকড়েকে দেখল। খড়্গবর্মাই ওটাকে ছুঁড়ে ফেলেছিল।

"জীবদত্ত, আমরা যে কথা ভেবেছিলাম সেই মতই সব হচ্ছে দেখছি। মরা নেকড়েকে ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে যে চার পাঁচটা নেকড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ওগুলো কোথায়? আর ভালুক দলের লোকগুলো গেল কোথায়? ওরা কি দুর্গে আছে, না জঙ্গলে পালিয়েছে?" বলল খড়্গবর্মা।

জীবদত্ত সাথে সাথে তাকে কোন জবাব দিল না।

কান খাড়া করে কিছু শোনার চেষ্টা করে বলল, "খড়্গবর্মা, দুর্গে কি যেন হৈ চৈ হচ্ছে। মনে হচ্ছে কি যেন ঘটেছে। সবাই কিছুক্ষণ চুপ করে শোনার চেষ্টা কর। তারপর আমরা কর্তব্য স্থির করব।"

কিছুক্ষণ নীরবতার পর চন্দু বলল, "হুজুর, নেকড়েদের ভয়ঙ্কর চিৎকার শুনতে পাচ্ছি।"

সময়বাহু চোখ বড় বড় করে মাথা নেড়ে বলল, "আমি শুধু নেকড়েদের গর্জনই শুনতে পাচ্ছি না, গুরু-ভালুকের চিৎকারও শুনতে পাচ্ছি। এখানে আমাদের আর এক মুহূর্তও থাকা উচিত নয়। আক্রান্ত হওয়ার আগেই আমাদের পালানো উচিত।"

"তুমি না একটা সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখছিলে? তুমি এত ভীরু কেন? তোমার প্রাণের এত ভয়?" খড়্গবর্মা কিছুটা ক্ষোভ প্রকাশ করে ও বিরক্ত হয়ে বলল।

সমরবাহু হাতের বল্লমটাকে শক্ত করে ধরে দৃঢ়তার সাথে বলল, "সাম্রাজ্য স্থাপনের ইচ্ছে আছে বলেই এত তাড়াতাড়ি মরতে চাই না। আপ্রাণ চেষ্টা করে বাঁচতে চাই।"

সমরবাহুর কথা শুনে খড়্গবর্মা হাসতে গিয়ে জীবদত্তের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল। হাসতে পারল না। প্রতিপক্ষের বিষয়ে কি যেন বলতে গিয়েও বলতে পারল না। তার চোখে নির্দেশের ছাপ। জীবদত্ত এগিয়ে যেতে যেতে বলল, "সমরবাহু, তুমি এই মন্ত্রদণ্ড আর খড়্গবর্মার তরবারি দেখেছ? এই দুটো তোমাকে অক্ষত দেহে স্বর্ণাচারির কাছে পৌঁছে দেবে। তার মানে এই নয় যে চরম বিপদেও তোমাকে তোমার বল্লম ব্যবহার করতে বারণ করছি। আমরা তোমাকে উদ্ধার করতে এসেছি। এটা ঠিক যে তোমাকে উদ্ধার করার মূল দায়িত্ব আমাদের। আমরা সমস্ত রকমের ঝুঁকি নিয়ে তোমাকে উদ্ধার করতে বদ্ধ পরিকর। আমাদের সঙ্গে থেকে তুমিও নিশ্চয় চেষ্টা করবে উদ্ধার হতে। আমাদের মত তোমাকেও আন্তরিকভাবে চেষ্টা করতে হবে।"

তারপর তারা এগিয়ে যেতে লাগল সুড়ঙ্গ পথ ধরে।

তারা যত এগোতে থাকে ভালুক জাতের লোকের আর্তনাদ ও নেকড়েদের গর্জন বেশি করে শুনতে পায়।

খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত আশ্চর্য হয়ে ভাবে মাত্র চার পাঁচটা নেকড়ে দুর্গের মধ্যে এতটা আতঙ্কের সৃষ্টি করতে পারল কি করে!

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা ভালুক জাতের লোকের আস্তানায় পৌঁছে গেল। জীবদত্তের সন্দেহ হল গুরু-ভালুক বৃকেশ্বরী দেবীর কাঠের মূর্তির ঘরে আছে।

"খড়্গবর্মা, আমার মনে হচ্ছে ভালুক জাতের সবাই জঙ্গলে পালিয়ে যায়নি। ওরা চলে গেলে নেকড়েগুলো এখানে

থাকত না। আবার ওদের নজরে পড়ে গেলে এখান থেকে বেরোন আমাদের পক্ষে কঠিন হবে।” চারদিকে তাকাতে তাকাতে জীবদত্ত বলল।

জীবদত্তের কথা শেষ হতে না হতেই ভালুক জাতের একজন আর্তনাদ করতে করতে ছুটে এল।

আর তার পেছনে তাকে ধাওয়া করে আসছে একটা নেকড়ে। মুহূর্তে খড়্গবর্মা তৎপরতার সঙ্গে দ্রুতবেগে তরবারি বের করে ঐ নেকড়েকে আঘাত করল।

খড়্গবর্মার কাছ থেকে আঘাত পেয়ে গোঙাতে গোঙাতে নেকড়ে যে পথে এসেছিল সেই পথেই ফিরে গেল।

ভালুক জাতের লোক নেকড়ের তাড়া খেয়ে এসে একেবারে খড়্গবর্মা ও জীবদত্তের সামনে পড়ে গেল। ওদের দেখে ভয়ে কাঁপতে লাগল। ওদের অবস্থা দেখে জীবদত্ত তার কাছে গিয়ে বলল, “ওহে গুরু ভালুকের শিষ্য তুমি যে এখন আমাদের কাছে এসেছ এ-সবই দেবী বৃকেশ্বরীর মহিমা। তুমি তাড়াহুড়ো করে জোরে জোরে কথা বল না। আমি যে সব প্রশ্ন করব তুমি আস্তে আস্তে তার জবাব দেবে।”

“আর শোন, একটিও মিথ্যে কথা বলেছ কি গলা কেটে ফেলব।” খড়্গবর্মা তরবারি দেখিয়ে বলল।

“এবার বল দেখি, তোমার গুরু-ভালুক এখন কোথায়? তোমার দলের সবাই এখনও সুড়ঙ্গে আছে না জঙ্গলে পালিয়েছে। তাড়াতাড়ি সত্য কথা বল। আর তা না হলে…।” জীবদত্ত মন্ত্রদণ্ড নাড়তে নাড়তে বলল।

“আজ্ঞে আমাদের এই সুড়ঙ্গ থেকে একজনও পালিয়ে যায়নি। নেকড়েদের ভয়ে এদিকে ওদিকে লুকিয়ে থাকতে পারে। গুরু-ভালুক বৃকেশ্বরী দেবীর ঘরে পূজো করছেন।” ভালুক জাতের লোক বলল।

“তোমরা তো মানুষদের ধরে ধরে গোলাম বানিয়ে কাজ করাও! বীরপুরুষ!

নেকড়েদের এত ভয় পাও কেন?” খড়্গবর্মা বলল।

“মানুষগুলো তো ঠাণ্ডা হয়, পোষ মানে। কিন্তু ঠাণ্ডা হয় না এই নেকড়েগুলো। ওদের প্রাণের ভয় নেই।” ভালুক জাতের লোকটি বলল।

ওর কথায় জীবদত্ত হেসে বলল, “ভয় পেয়েছ তা স্বীকার না করে বেশ ভালো ভাবেই দেখছি তুমি অন্য কথা বলতে পারো। যাক্, গুরু-ভালুক যদি বৃকেশ্বরী দেবীর ঘরে না থাকে তাহলে তোমাকে মেরে ফেলা হবে।”

“আমি মিথ্যা কথা বলি না হুজুর। ইচ্ছে করলে আপনারা গিয়ে দেখতে পারেন।” জীবদত্তের সামনে নুয়ে ভালুক জাতের লোকটা বলল। চারদিকে চোখ ফেরাতে ফেরাতে শুনছিল খড়্গবর্মা।

“ঠিক আছে, চল। এখনই প্রমাণ পেয়ে যাব। ধোকা দেবার চেষ্টা করলে জ্যান্ত রাখব না।” জীবদত্ত গম্ভীর গলায় ধমক দিয়ে বলল।

তারপর গুরু-ভালুকের শিষ্য খড়্গবর্মা ও জীবদত্তকে নিয়ে এগোল। কিছুদূর গিয়ে ওদের বলল, “ওই দেখুন হুজুর, বৃকেশ্বরী দেবীর ঘরে গুরু-ভালুক রয়েছেন।”

খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত কিছুক্ষণ নিজেদের মধ্যে কথা বলে নিল। এর পর কি করবে
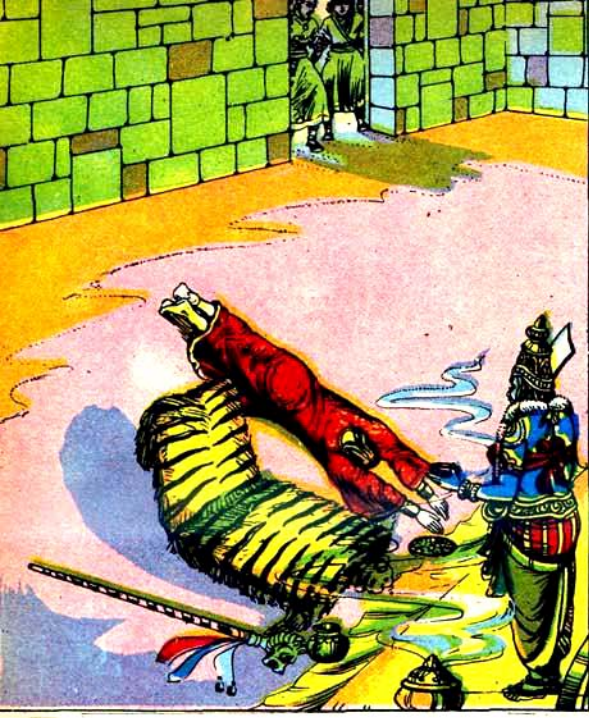
না করবে ঠিক করে নিল। অজানা জায়গায় অজানা মানুষের বিরুদ্ধে চরম আঘাত হানার প্রস্তুতি নিয়ে নিল তারা।

খড়্গবর্মা পা টিপে টিপে এগিয়ে দরজা আস্তে আস্তে ঠেলল। একটু ঠেলতেই সহজেই খুলে গেল দরজাটা।

দেখতে পেল বৃকেশ্বরী দেবীর সামনে সাষ্টাঙ্গে গুরু-ভালুক পড়ে আছে। কি যেন বিড় বিড় করে বলছে। ইঙ্গিতে জীবদত্তকে কাছে ডেকে ফিসফিস করে কি যেন বলল।

জীবদত্ত খড়্গবর্মাকে পাল্টা প্রশ্ন করল, "তুমি কি চাও এখানেই গুরু-ভালুককে মেরে ফেলি।"

জীবদত্ত কিছুক্ষণ ভেবে বলল, "খড়্গ-বর্মা, এই গুরু-ভালুককে মেরে কি হবে? আর ওর শিষ্যদেরই বা মেরে কোন লাভ আছে? তার চেয়ে একটা মজা করা যাক। তুমি ওই মূর্তির পেছনে চলে যাও। সেখান থেকে অন্যরকম গলায় যেন বৃকেশ্বরী দেবী নির্দেশ দিচ্ছেন এমনভাবে বল যাতে গুরু-ভালুক শিষ্যসহ এই সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে বনে চলে যায়।"

"বললেই চলে যাবে? তুমি বিশ্বাস কর? আমি আরও দু'চার কথা জুড়ে দেব। তবে একটা কথা ও যদি টের পেয়ে কায়দা করে এসে আমার উপরেই হামলা চালায় তাহলে কিন্তু আমি এই তরবারি দিয়ে ওকে মেরে ফেলব।" বলল খড়্গবর্মা জীবদত্তকে।

"যা করতে চাও তাড়াতাড়ি কর। ওর পূজো হয়ে গেলে আর আমরা কায়দা করতে পারব না।" অনেক কিছু ভেবে বলার মত জীবদত্ত বলল।

খড়্গবর্মা বিড়ালের মত পা টিপে টিপে ওই মূর্তির পেছনে গিয়ে গুরুগম্ভীর গলায় বলল, "গুরু-ভালুক আমি তোমার ভক্তিতে প্রসন্ন। দেবদ্রোহীরা এই সুড়ঙ্গে ঢুকে এটাকে অপবিত্র করে ফেলেছে। আমি এই মুহূর্তে এখান থেকে অন্তর্ধান হয়ে পূব দিকের বনে চলে যাচ্ছি। বেশ কিছুদূর

যাবার পর দেখতে পাবে একটি পুকুর আর তার পাশে বাবলা গাছ। তুমি তোমার সমস্ত শিষ্যদের নিয়ে এখান থেকে ওখানে চলে যাও।"

একথা শুনেই গুরু-ভালুক চমকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কি যেন বলতে যাচ্ছিল এমন সময় ধমক দিয়ে মূর্তির পেছন থেকে খড়্গবর্মা বসে অন্য রকম গলা করে এক একটা শব্দ থেমে থেমে বলল, "ওরে পাষণ্ড, তুই এখনো দাঁড়িয়ে আছিস ? এক্ষুনি চলে যা, শিষ্য-দের নিয়ে যেতে ভুলবি না ।"

গুরু-ভালুক হতভম্ব হয়ে দেবীর সামনে আবার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ওকে বেরিয়ে আসতে দেখেই জীবদত্ত ও তার সঙ্গের অন্য লোক-গুলো লুকিয়ে পড়লো।

গুরু-ভালুকের মনে, দেবীর কথা শোনার পর, পূর্ণ বিশ্বাস এবং শক্তি যেন ফিরে এল। তার মনে আর কোন দ্বিধা নেই। নিজের পঞ্চশূল উঁচিয়ে চিৎকার করে বলল, "হে বৃকেশ্বরী দেবীর ভক্তগণ, তোমরা সবাই এই মুহূর্তে এই সুড়ঙ্গ ছেড়ে দূরে যাবার জন্য রওনা হয়ে যাও। দেবীর নির্দেশ মতো আমাদের এখান থেকে এক্ষুনি বেরিয়ে যেতে হবে বনে।"

নেকড়েদের ভয়ে যারা এতক্ষণ এদিকে ওদিকে লুকিয়ে ছিল তারা সব সুড়ঙ্গ
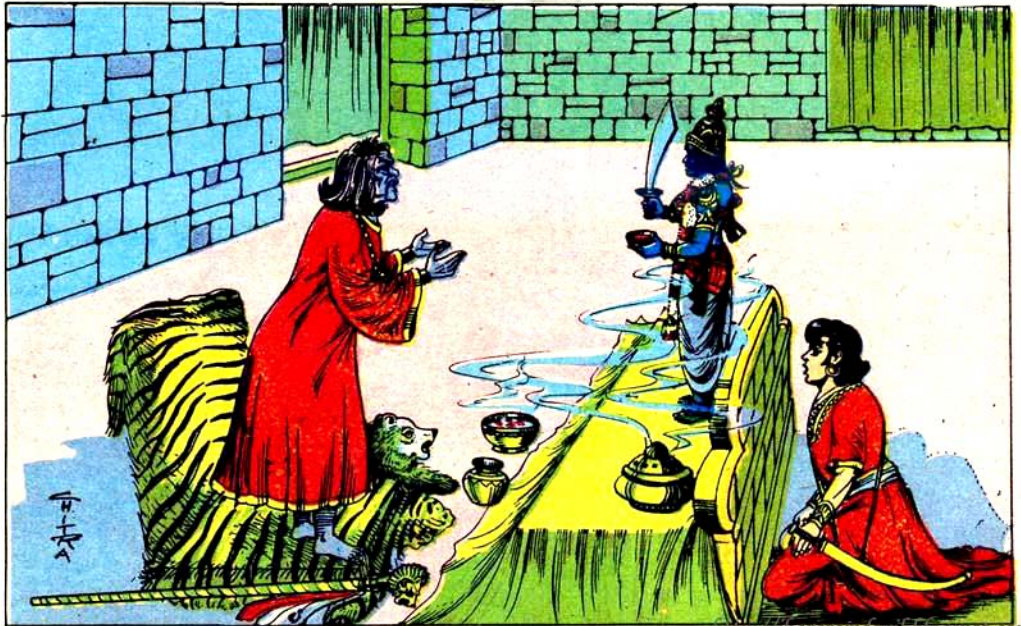
থেকে বেরিয়ে গেল হুড়মুড় করে। নেকড়েগুলো দুর্গের ভিতরে ঘুরতে ঘুরতে আপন মনে যেখানে সেখানে ঢুকে খুঁজে দেখতে লাগল কোন খাদ্য আছে কিনা আর খাদ্য না পেয়ে গর্জন করতে লাগল।

গুরু-ভালুক সুড়ঙ্গের চারদিকে তাকিয়ে তার শিষ্যদের খুঁজতে লাগল। কিন্তু তাদের দেখা তো দূরের কথা সারাও পেল না। তারপর একাকী সুড়ঙ্গ থেকে বনের দিকে এগিয়ে গেল।

গুরু-ভালুক সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এসে দেখে শিষ্যরা তার অনেক আগেই বনের ভেতরে চলে গেছে।

বৃকেশ্বরী দেবীর কথা শোনার পর গুরু-ভালুকের মনে এক চিন্তা এক পরিকল্পনা। কি করে বনে যাওয়া যায়। তার লোকজন সব কোথায়? ওরা লুকিয়ে আছে কেন? নেকড়েদের খাবার ঠিকমত দেওয়া হয়েছে কিনা? নেকড়েদের নিয়ে কি বনে যাবে? একবারও খড়্গবর্মা, জীবদত্ত, সমরবাহু ও চন্দুর কথা উঁকি মারল না। সে ভাবতেই পারল না যে ওরা তার কোন ক্ষতি করতে পারে।

গুরু-ভালুকের সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত খুঁজে খুঁজে নেকড়েদের তাড়া করে বের করে দিল সুড়ঙ্গ থেকে। একটা নেকড়ে ওদের দিকে তেড়ে এসেছিল কিন্তু পর-মুহূর্তেই তাকে মারা পড়তে হল। নেকড়েগুলো বেরিয়ে এসেই দেখতে পেল সামনে গুরু-ভালুককে। ক্ষুধার্ত নেকড়েগুলো গুরু-ভালুককে ধরে টেনে ছিঁড়ে খাওয়ার জন্য ধাওয়া করতে লাগল।

নেকড়েদের ওই হিংস্ররূপ দেখে প্রাণের ভয়ে গুরু-ভালুক ছুটতে ছুটতে আর্তনাদ করতে লাগল, "হে বৃকেশ্বরী দেবী, আমাকে বাঁচাও!"

(আরও আছে)
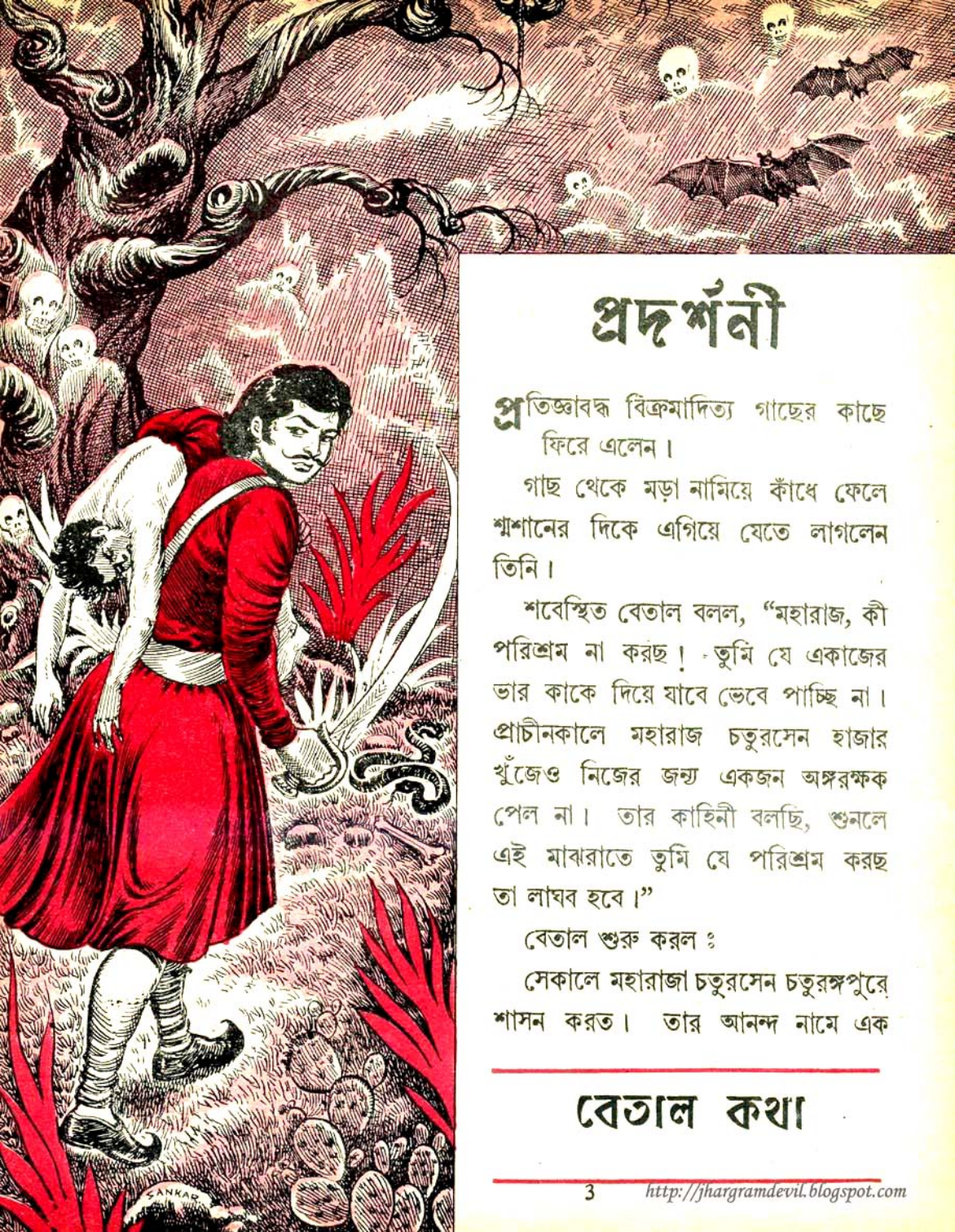
প্রদর্শনী

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য গাছের কাছে ফিরে এলেন।

গাছ থেকে মড়া নামিয়ে কাঁধে ফেলে শ্মশানের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন তিনি।

শবেস্থিত বেতাল বলল, "মহারাজ, কী পরিশ্রম না করছ! তুমি যে একাজের ভার কাকে দিয়ে যাবে ভেবে পাচ্ছি না। প্রাচীনকালে মহারাজ চতুরসেন হাজার খুঁজেও নিজের জন্য একজন অঙ্গরক্ষক পেল না। তার কাহিনী বলছি, শুনলে এই মাঝরাতে তুমি যে পরিশ্রম করছ তা লাঘব হবে।"

বেতাল শুরু করল ঃ

সেকালে মহারাজা চতুরসেন চতুরঙ্গপুরে শাসন করত। তার আনন্দ নামে এক

বেতাল কথা

অঙ্গরক্ষক ছিল। সে রাজাকে বহুবার নানাবিধ বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছিল।

হাজার চোখে যেন সে রাজাকে পাহারা দিত। একবার আনন্দের কঠিন অসুখ করার ফলে তার হাত খসে পড়ল। বহু বদ্যি চেষ্টা করেও তাকে সারাতে পারেনি। সারা জীবন তাকে হাত হারিয়ে কাটাতে হয়েছে।

একদিন আনন্দ রাজাকে বলল, "মহারাজ, যতদিন আমি আপনার পাশে ছিলাম ততদিন আমি আমার জীবন দিয়ে আপ- নাকে রক্ষা করেছিলাম। কিন্তু এখন যতদিন না আপনার জন্য একজন উপযুক্ত অঙ্গরক্ষকের সন্ধান পাচ্ছি ততদিন আমি শান্তি পাব না।"

চতুরসেন আনন্দের রাজভক্তি যে কত বেশি তা জানত।

আর আনন্দের মত একজন অঙ্গরক্ষক রাজার না থাকলে চলে না।

"তা এ ব্যাপারে অত ভেবে মরছ কেন? আমার অঙ্গরক্ষক নিযুক্ত করার দায়িত্ব সেনাপতি ও মন্ত্রীর।" রাজা বলল।

"তা আপনি ঠিকই বলেছেন মহারাজ। কিন্তু আমি একটি কথা ভাবছি। আপনি সুধন্যর নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন। আমাদের রাজ্যে ওর চেয়ে বড় ধনুর্বিদ আর কেউ নেই। দূরসম্পর্কে সে আমার আত্মীয়। আপনি একবার তাকে ধনুর্বিদ্যা প্রদর্শনের জন্য ডেকে পাঠান। বললে সে নিশ্চয় আসবে।" বলল আনন্দ।

সুধন্যকে ডেকে পাঠান হল। সুধন্য ধনুর্বিদ্যার নানা কৌশল রাজাকে দেখাল। তার আগে সে রাজাকে সবিনয়ে বলল, "মহারাজ, আমার বয়স বেড়েছে, হয়ত আমার কলা কৌশল আপনার ততটা ভাল লাগবে না।"

তারপর সে দেখাল নানান ধরণের মজার খেলা।

ঐ খেলা দেখে রাজসভার প্রত্যেকে স্তব্ধ হয়ে গেল।

হঠাৎ একসময় সুধন্য বলল, "যে কোন একজন মাথায় ফল রেখে এখান থেকে একশো গজ দূরে দাঁড়ান, আমি সেই ফল ফেলে দেব। যারা ভীরু, যাদের প্রাণের ভয় আছে তারা এখানে আসবেন না। কোই এবার কার সাহস আছে এগিয়ে আসুন।"

সুধন্যের ক্ষমতা সম্পর্কে উপস্থিত লোকের ধারণা ছিল।

তাই দশ বারো জন যুবক এগিয়ে এল। তখন সুধন্য বলল, "আমি বুঝলাম যে এই দশ বারো জনের আমার ক্ষমতার উপর বিশ্বাস আছে। তবে তোমরা হয়ত কোন দিন দেখনি আমার তীর ছোঁড়া। হয়ত লোকমুখে শুনেছ। আমারও অনেক দিন অভ্যেস নেই। তবু দু'একবার অন্য কিছু লক্ষ্যভেদ করে তার পর মাথার ফল ফেলব।"

সুধন্যের চাহিদা অনুসারে রাজা একটি থালা ও একটি সোনার কৌটো এবং একটি রূপোর কৌটো আনিয়ে তাকে দিলেন।

সুধন্য অনেক দূরে দাঁড়িয়ে ঐ থালে রাখা কৌটোগুলোর দিকে দেখিয়ে বলল, "আমি রূপোর কৌটোর ঢাকনা ফেলে দেবার চেষ্টা করব।"

পরমুহূর্তেই সুধন্যের হাত থেকে তীর ছুটে বেরিয়ে গেল। সোনার কৌটোর ঢাকনা ছিটকে বেরিয়ে গেল দূরে। সুধন্যের মুখ ঝুলে গেল। দর্শক সবাই সুধন্যর এই ব্যর্থতায় অবাক হয়ে গেল।

তারপর সুধন্য আর একবার চেষ্টা করল।

দুটো হাঁড়ি আনাল।

এক হাঁড়িতে থাকবে জল অন্য হাঁড়িতে গোলাপজল। দূরে গিয়ে সুধন্য বলল, "গোলাপজলের হাঁড়ি ফুটো করব আমি।"

তীর সোজা গিয়ে জলের হাঁড়ি ফুটো করল।

পরক্ষণেই সুধন্য বলল, "এখন আমি ঐ ফুটো বন্ধ করে দিচ্ছি।" বলে একটি তীর ছুঁড়ল।

তীর গিয়ে ঐ ফুটোর মুখ বন্ধ করে দিল।

তখন সুধন্য যুবকদের বলল, তোমরা লক্ষ্য করেছ আমার মন একটু অশান্ত। আমি ঠিক লক্ষ্যভেদ করতে পারছি না। এখন তোমরা আবার ভেবে বল তোমাদের মধ্যে কে মাথায় ফল নিয়ে আমার সামনে দাঁড়াতে প্রস্তুত আছ।"

একথা শুনে মাত্র একজন যুবক এগিয়ে এসে বলল, "আমি প্রস্তুত আছি।"

ঐ সময় আনন্দ রাজার কাছে গিয়ে কানে কানে বলল, "মহারাজ, একেই আপনার অঙ্গরক্ষক হিসেবে নির্বাচন করতে যাচ্ছি।"

তারপর যুবক মাথায় একটি ফল রেখে দাঁড়ানোর জন্য দূরে গেল।

সেখানে মাথায় ফল রেখে প্রস্তুত হল।

সুধন্য ধনুকে তীর জুড়ে দাঁড়ানোর পরেও ঐ যুবকের চোখে-মুখে ভয়ের কোন চিহ্ন ছিল না। দর্শকদের মধ্যে প্রচণ্ড ভয়ের সঞ্চার হল।

সুধন্য যুবকের কাছ থেকে একশো গজ দূরে দাঁড়িয়ে তীর ছুঁড়ল।

মুহূর্তে যুবকের মাথার উপর থেকে ফল উড়ে গেল।

যুবক একটুও বিচলিত হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ আসন থেকে উঠে যুবককে অভিনন্দন জানিয়ে তাকে নিজের অঙ্গরক্ষক করে নিল।

বেতাল এই কাহিনী শুনিয়ে বলল, "মহারাজ, আমার মনে একটা সন্দেহ জেগেছে। রাজার জন্য দরকার ছিল একজন অঙ্গরক্ষক।

"তাহলে আনন্দ ধনুর্বিদ্যা প্রদর্শনের আয়োজন রাজাকে করাল কেন? রাজাই বা তাতে রাজী হল কেন? সুধন্য যখন জানত যে সে লক্ষ্যভেদ করতে পারছে না তখন সে কেন ঐ প্রদর্শনের নামে যুবকদের বিব্রত করল?"

"সবাই যখন পেছিয়ে গেল তখন এক-জন যুবকই বা এগিয়ে এল কোন্ ভরসায়?

আনন্দই বা রাজাকে পরামর্শ দিল কেন ঐ যুবককে অঙ্গরক্ষক হিসেবে নিয়োগ করতে?"

"আমার এইসব প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না বল তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।"

একথায় জবাবে বিক্রমাদিত্য বললেন, "অঙ্গরক্ষকের নির্বাচন বা পরীক্ষা করে নিয়োগের ব্যাপারে রাজার যত না চিন্তা ছিল তার চেয়েও বহুগুণ বেশি চিন্তা ছিল আনন্দের।"

"আনন্দের কথামতই রাজা ধনুর্বিদ্যা প্রদর্শনের আয়োজন করলেন।"

"কারণ আনন্দের প্রত্যেকটি কথা রাজা রাখতেন। সুধন্যের লক্ষ্যভ্রষ্টের মূলে ছিল সাহসী যুবক নির্বাচনের চেষ্টা। সুধন্য ভালোভাবেই জানত যে তার তীর লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হবার নয়।"

"এবং তা জানত বলেই প্রদর্শনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিল।"

"যুবকদের মধ্যে যারা ছিল ভীরু, যাদের বুদ্ধি ছিল কম, তারাই পেছিয়ে গেল।"

সুধন্যের প্রস্তাবে রাজী হয়ে নির্ভয়ে যে যুবক এগিয়ে এল একমাত্র সেই যুবকই বুঝতে পেরেছিল যে সুধন্যের লক্ষ্য অভ্রান্ত। এবং বুঝেছিল বলেই সে সাহস করে এগিয়ে এসেছিল। গোটা ব্যাপার-টাই ছিল আনন্দের পূর্ব পরিকল্পিত। আনন্দ তার দূরাত্মীয়কে দিয়ে এই কাজ করিয়েছিল বলেই পূর্ণ আত্মবিশ্বাসে রাজাকে পরামর্শ দিয়েছিল।

আর তার পরামর্শ অনুসারেই ঐ যুবককে রাজা নিজের অঙ্গরক্ষক হিসেবে নিয়োগ করলেন।"

রাজার এই ভাবে মৌনভাব ভঙ্গ করার সাথে সাথে বেতাল শব থেকে বেরিয়ে আবার গিয়ে বৃক্ষলগ্ন হল।

(কল্পিত)

নকল সাধু

প্রাচীনকালে এক সাধু নগরে শিষ্যদের নিয়ে হাজির হয়ে প্রচার করল, "যারা নরক যন্ত্রণা ভোগ করছে তাদের আমি নরক থেকে স্বর্গে পাঠাতে পারি।

বহুলোক ঐ সাধুকে নানাবিধ জিনিস দিয়ে অনুরোধ করল তাদের পূর্ব পুরুষদের স্বর্গে পাঠাতে। এই খবর গেল রাজার কানে। রাজা প্রজাদের বোকামীতে দুঃখ পেলেন। শেষে ভেবে চিন্তে ঐ সাধুকে কারাগারে পাঠালেন।

তখন ঐ সাধুর শিষ্য ও কয়েকজন প্রজা রাজার কাছে গিয়ে বলল, "মহারাজ, এই সাধু খুব ভাল মহাত্মা। আপনি তাঁকে মুক্তি দিন।"

"আমাকে মুক্তি দিতে হবে কেন। যে সাধু নরকের লোককে সরাসরি স্বর্গে পাঠাতে পারেন সেই সাধু কি নিজের চেষ্টায় কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বাইরে আসতে পারেন না?" রাজা বললেন। প্রজারা সাধুর ক্ষমতা সম্বন্ধে যেন নতুন করে ভাবতে বসল। সাধুর উপর তাদের মোহ কেটে যেতে লাগল।
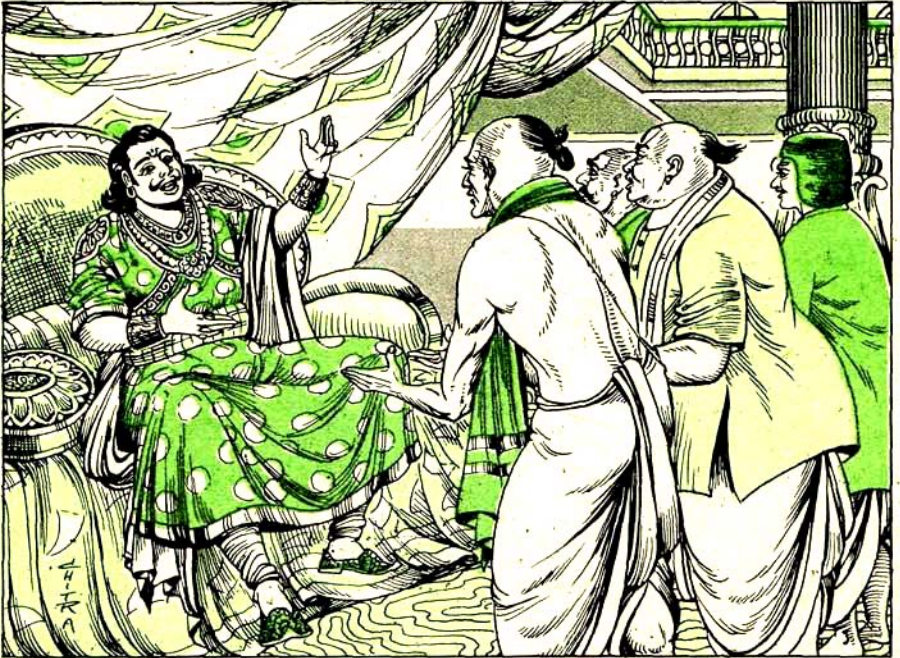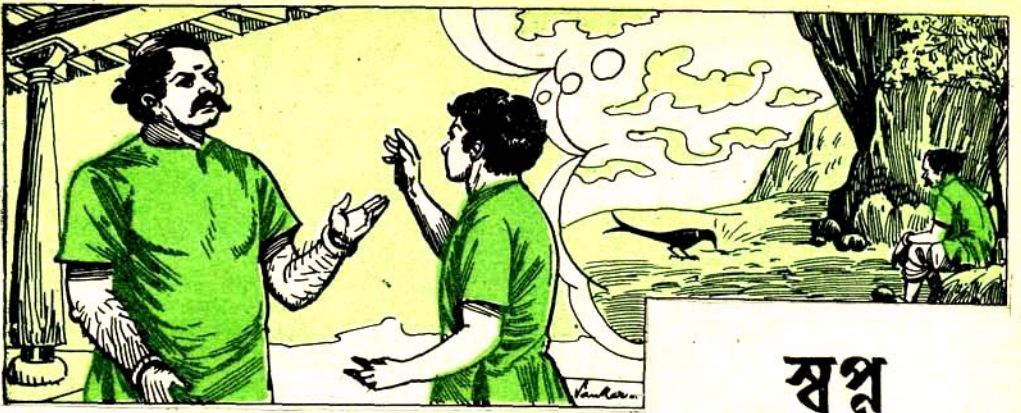
স্বপ্ন

এক দম্পতি মেলায় গেল তাদের পাঁচ বছরের ছেলেকে নিয়ে। নদীর তীরে মেলা বসে। নদীতে চান করতে নেবে দম্পতি কুমিরের পেটে গেল। পাঁচ বছরের ছেলে রামেশ্বর অনাথ হল। সে ঐ মেলায় হাউ মাউ করে কাঁদতে কাঁদতে তার বাবা মাকে কুমিরে টেনে নিয়ে যাওয়ার কথা বলছিল। এক ব্যাধ রামেশ্বরকে নিজের বাড়ি নিয়ে গেল। উদ্দেশ্য অনাথ ছেলেকে লালন পালন করা।

ঐ ব্যাধের নাম নন্দনকুমার। তার বাড়িতে রামেশ্বর সানন্দেই ছিল। যে কোন কাজ চটপট করে ফেলত। তার গলাও ছিল মধুর। গান গাইতে পারত ভাল। ওর গান শুনে গরু মোষ পশু পাখি সব জমে যেত। রামেশ্বরের আর একটা ভাল দিক হল সে যে স্বপ্ন দেখত কার্যত তা ফলত।

একদিন রামেশ্বর নন্দনকুমারকে বলল, "কাল রাত্রে আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি। পাখি ধরার জন্য আপনি জাল ফেলে একটি গাছের নিচে বসে আছেন। কালো পাখি জমিতে ঠোকরাল। আপনি ঐ জায়গাটা খুঁড়ে মুক্তো ভরা একটা ঘড়া পেলেন।"

নন্দনকুমার রামেশ্বরের কথা কানে তোলেনি। কিন্তু সাত দিনের মধ্যে তার স্বপ্ন ফলল। সে মণি মুক্তার ঘড়া পেল। এইভাবে রামেশ্বর আরও দু তিনবার স্বপ্ন দেখল। সেই স্বপ্ন অনুযায়ী কাজ হল। এর ফলে নন্দনকুমার প্রত্যেকদিন সকালে উঠে রামেশ্বরকে জিজ্ঞেস করত সে কোন স্বপ্ন দেখেছে কিনা। একদিন রামেশ্বর

অপূর্ব চক্রবর্তী

সকালে ঘুম থেকে উঠেই বলল, "রাত্রে চমৎকার একটা স্বপ্ন দেখেছি।"

"কি স্বপ্ন বল, তাড়াতাড়ি?" বলল নন্দনকুমার।

এটা নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপারের স্বপ্ন।

নন্দনকুমার বার বার জানতে চাইল স্বপ্নটা কিসের। কিন্তু সে কিছুই জানাল না। ফলে নন্দনকুমার খুব রেগে গিয়ে রামেশ্বরকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল।
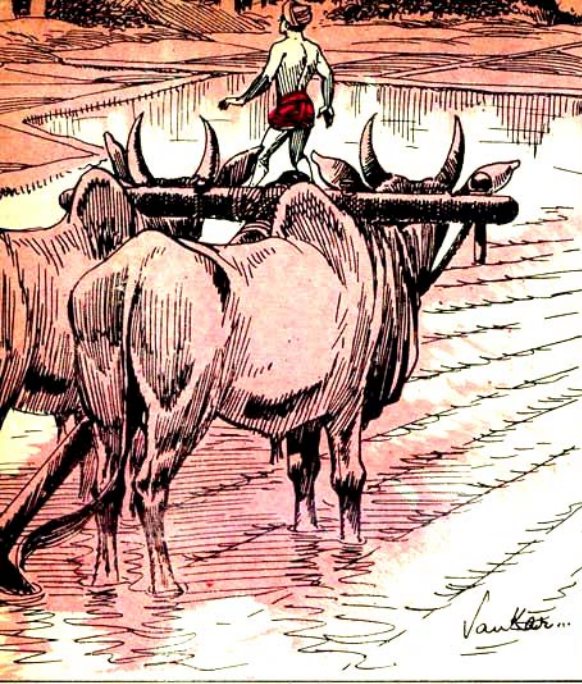
রামেশ্বর পথে বেরিয়ে সোজা উত্তর দিকে গেল। দু-তিনটি গ্রাম পেরিয়ে সে দেখতে পেল একটি পুকুর। পুকুর ঘাটে একটি লোক কি যেন ভাবছিল। রামেশ্বর তার কাছে গিয়ে বলল, "আমি অনাথ। ক্ষেত খামারের কাজ করতে পারি। খাওয়া পরার পরিবর্তে আমাকে যে কোন কাজ দিতে পারেন।"

লোকটা রামেশ্বরকে বলল, "কোন ক্ষেত থেকে লাঙ্গলে যোথা একজোড়া বলদ সকলের চোখে ধুলো দিয়ে যদি আনতে পার তাহলে তোমাকে কাজ দেব।"

রামেশ্বর তাতে রাজী হয়ে চলে গেল। কিছুদূর গিয়ে দেখতে পেল একটা লোক লাঙ্গল চালাচ্ছে। সে গাছের আড়ালে গিয়ে মধুর কণ্ঠে গান গাইতে লাগল। ঐ গান শুনে কিষাণ কাজ বন্ধ করে দিল। বলদগুলো এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল।

লাঙ্গল বলদ ক্ষেতেই ছেড়ে কিষাণ গায়ককে খুঁজতে লাগল। গাইতে গাইতে অনেক দূর চলে গেল রামেশ্বর। তারপর হঠাৎ একসময়ে গান থামিয়ে অন্য পথে ক্ষেতে চুপি চুপি এলো। ক্ষেতে এসে দেখল বলদ লাঙ্গল রয়েছে। সে ওগুলো নিয়ে চলে গেল।

রামেশ্বরকে যে লোকটা বলদ আনলে কাজ দেব বলেছিল, সে তাকে কাজ দিল। লোকটা নিজে কিষাণ হলেও বলদ চুরি করা তার পেশা ছিল।

এইভাবে চলছিল দিনের পর দিন। যে বলদ চুরি করে সে বিক্রিও করে। একদিন নন্দনকুমার তার কাছে বলদ কিনতে

এসে রামেশ্বরকে দেখে বলল, "আরে রামেশ্বর তুমি এখানে ?"

"আপনি একে চেনেন নাকি ?" গুঁফো বলদচোর লোকটা বলল।

"একে আমিই তো কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি। এর একটা বড় গুণ হল এ যে স্বপ্ন দেখে সেটাই ফলে। আমার বাড়ি থেকে চলে আসার আগে ও একটা স্বপ্ন দেখেছিল। আমাকে সেটা বলেনি বলে আমার খুব রাগ হয়েছিল। তাই আমি ওকে তাড়িয়ে দিয়েছি। এর জন্যই তো আমি দুটো পয়সার মুখ দেখতে পেয়েছি।" নন্দনকুমার বলল।

একথা শুনে গুঁফো লোকটা বলল, "কই এর আসার ফলে আমার তো কিছুই হয়নি।" বলেই সে রামেশ্বরকে বলল, "কিহে তুমি আমাদের বাড়িতে আসার পর কি স্বপ্ন দেখেছ বল ?"

রামেশ্বর জানাল যে সে ঐ বাড়িতে এসে কোন স্বপ্ন দেখেনি।

"হারামজাদা, আমার বাড়িতে থেকে, আমার খেয়ে, আমার পরে কোন স্বপ্ন দেখনি ?" বলে তাকে মারতে গেল।

সেখান থেকে পালিয়ে রামেশ্বর অন্য গ্রামে চলে গেল। সেই গ্রামে এক ধনী একটা সুন্দর ঘোড়ার গাড়ি থেকে নেবে ঘুড়ী কেনার জন্য দরদাম করছিল। ঘুড়ীর ব্যবসাদার বলল, "আমার এই দুটো ঘুড়ীর মধ্যে একটা মা অন্যটা মেয়ে। আপনারা বলুনতো কোনটা মা, কোনটা মেয়ে।"

দুটোই দেখতে প্রায় এক রকম। কোনটা যে কি বোঝা মুস্কিল। হঠাৎ কোত্থেকে উড়ে এসে রামেশ্বর বলল, "আমি বলতে পারি।" সে কোত্থেকে শুকনো ডালপালা এনে জড়ো করে আগুন ধরিয়ে ঐ দুটো ঘোড়াকে আগুনের সামনে ছেড়ে দিল। তাদের মধ্যে একটা ঘোড়া সাহস করে লাফ দিয়ে এগিয়ে গেল। অন্যটা পেছন ফিরল। রামেশ্বর জানিয়ে দিল যে ঘুড়ী এগিয়ে গেছে সেটা মা আর যেটা পেছিয়ে গেছে সেটা মেয়ে।

ব্যবসাদারও সেকথা স্বীকার করল। তখন ধনী লোকটা রামেশ্বরের বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হয়ে দুটো ঘুড়ী কেনার পর তাকে বলল, "তুমি আমাদের বাড়িতে এসো। একটি উপহার দেব।"

"আমার কেউ নেই। উপহারের চেয়ে আমাকে আপনার বাড়িতে একটা চাকরি দিলে অনেক বেশি উপকৃত হতাম।" রামেশ্বর আবেদনের ভঙ্গীমায় বলল।

ধনী ব্যক্তি রামেশ্বরকে গাড়িতে তুলে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল। ধনীর মেয়ে রত্নাবতী রামেশ্বরের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। ধনী মেয়েকে প্রশ্ন করল, "তুমি ওকে অমন করে দেখছ কেন মা?"

"আচ্ছা বাবা, ঘুড়ী দুটোকে আগুনের সামনে কি এই যুবকই ছুটিয়েছিল?" রত্নাবতী তার বাবাকে প্রশ্ন করল।

"হ্যাঁ মা, এই সেই বুদ্ধিমান যুবক।" ধনী বলল।

"আচ্ছা তুমিই কি গান গেয়ে বলদ দুটোকে চুরি করেছিলে?" রত্নাবতী জিজ্ঞেস করল।

"চুরি করেছিলাম বটে, তবে আমি চোর নই" রামেশ্বর বলল।

"তুমিই আমাকে একবার দেখে পালিয়ে ছিলে না?" রত্নাবতী প্রশ্ন করল।

"দেখেছিলাম বটে। তবে আমি তা নন্দনকুমারকে বলিনি। কারণ তাহলে সে আমাকে তাড়িয়ে দিত।" রামেশ্বর বলল।

ধনী রত্নাবতীর জন্য উপযুক্ত পাত্র খুঁজছিল। কিন্তু কোন পাত্রকেই রত্নাবতী পছন্দ করত না। সে তার বাবাকে বলত, "বাবা, আমাকে যে বিয়ে করবে সে তোমার সঙ্গে আমাদের বাড়িতে আসবে।"

রত্নাবতী সেই কথা বাপের কানে কানে বলে স্মরণ করিয়ে দিল। ধনী মেয়ের কথা শুনে খুশী হল। মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে রামেশ্বরকে ঘরজামাই করে নিল।
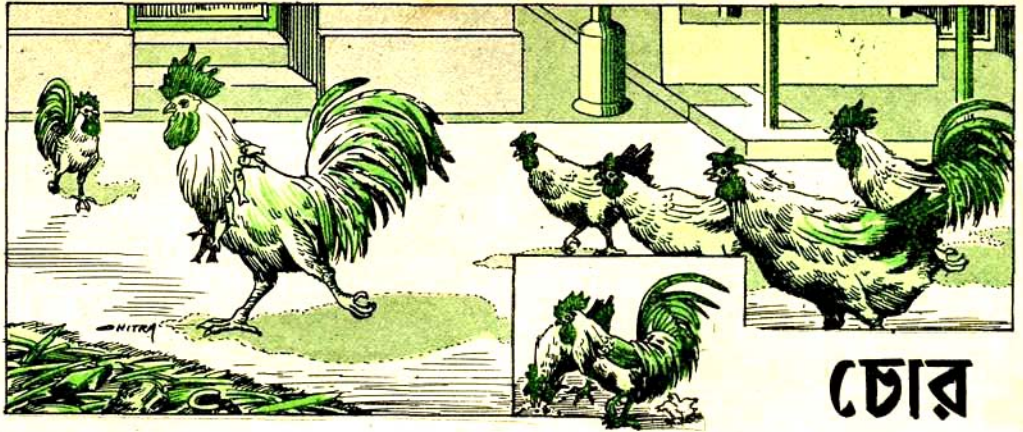
চোর

এক দেশে দীনু চৌধুরী নামে এক মুর্গীর ব্যবসায়ী ছিল। সে ছিল এক নম্বর ধোকাবাজ। কয়েকটা মুর্গী সে পুষত। সে ঐ মুর্গীগুলোকে মাছ খাওয়াত। আর কয়েকটা শুঁটকী মাছ তাদের গলায় বেঁধে ছেড়ে দিত। শুঁটকী মাছের হার দেখে পাড়ার অন্য মুর্গীগুলো ওদের সাথে সাথে আসত দীনুর বাড়িতে। যেসব মুর্গী তার বাড়িতে আসত ওদের গায়ে রং মাখিয়ে দিত। এর ফলে ঐ মুর্গীর মালিক তাদের চিনতে পারত না। দীনু বাজারে গিয়ে সহজেই বিক্রি করে দিয়ে আসতে পারত। যার মুর্গী হারাত সে অবাক হয়ে যেত। কিছুতেই খুঁজে পেত না। প্রত্যেকেই ভাবনায় পড়ে গেল অথচ কোন সুরাহা করতে পারল না।

ঐ গ্রামেই রামদাস নামে এক বিচিত্র মানুষ ছিল। সে সব সময় নিজের কাছে একটা বিড়াল ও এক জোড়া মুর্গী রাখত। ওগুলো না থাকলে যেন সে বাঁচতে পারে না। শিকার করা ছাড়া তার অন্য কোন কাজ ভাল লাগত না। গাঁয়ের মুর্গী চুরি হচ্ছে শুনেও সে যেন ততটা কানে তুলল না। দেখতে দেখতে রামদাসের জোড়া মুর্গী গায়েব হয়ে গেল। ওগুলোকে হারিয়ে রামদাস বাচ্চা ছেলের মত কান্নাকাটি করতে লাগল। সে ঠিক করল যে কোন ভাবে মুর্গীচোরকে ধরতেই হবে। সেদিন সে গ্রামে ঘুরে ঘুরে যত মুর্গী দেখতে পেল প্রত্যেকটা পরীক্ষা করে ভাল করে দেখল। এক জায়গায় সে এক বিচিত্র জিনিস লক্ষ্য করল। দেখল একটা মোরগের পিছনে

রত্না বসু

পিছনে অনেকগুলো মুর্গী ও মোরগ যাচ্ছে। কাছে গিয়ে রামদাস লক্ষ্য করল সামনের মোরগের গলায় শুঁটকী মাছের মালা ঝুলছে।

অন্যগুলো ঐ শুঁটকী খাওয়ার লোভে পিছনে পিছনে যাচ্ছে। ভাবল নিশ্চয় কেউ কোন উদ্দেশ্যে মোরগের গলায় শুঁটকী বেঁধেছে।

সামনের ঐ মোরগের গন্তব্যস্থল দীনু চৌধুরীর বাড়ি। তার ঐ বাড়িতে ঢোকার সাথে সাথে অন্যগুলোও ঐ বাড়ির ভিতরে ঢুকল। তখন রামদাস পরিষ্কার বুঝতে পারল গাঁয়ের হারানো মুর্গী আর মোরগ যাচ্ছে কোথায়। সে তৎক্ষণাৎ ঘরে ফিরে এসে পোষাক বদলে মাতালের মত পা ফেলতে ফেলতে দীনু চৌধুরীর বাড়িতে গেল। তার বাড়িতে ঢুকেই দেখে দীনু রং মাখানোর ব্যবস্থা করছে। তা দেখে মাতালের মত কথা জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, "দেখ কা-কা। ধ্যাৎ তুমি অ-সব কি করছ। ধ্যাৎ অত কিছু না করে পা-ল-ক কেটে দিলেইতো পার। কে-কে-উ চিনতে পারবে না।"

রামদাসের কথা শুনে দীনুর বুক কেঁপে উঠল। বলল, "আরে দূর পাগল, রং লাগাচ্ছি অন্য কারণে। দুপয়সা বেশি পাব। এছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। ভাল কথা, মনে হচ্ছে তুমি আমার কাছে কোন কাজে এসেছ?"

"কি ব-ল-ব কাকা, আজ কিচ্ছু শিকার করতে পারিনি। তুমি তো জান আমি মাংস ছাড়া খে-তে পারি না। ভাল এক জোড়া মুর্গী থাকলে দাও তো।" রামদাস বলল।

"ভাল মুর্গী আছে বৈকি। কালকেই কিনে এনেছি এক জোড়া ভাল মুর্গী। বলল দীনু চৌধুরী।

"দেখাও দিকি। বলতে বলতে রামদাস ভিতরে চলে গেল। ভিতরে গিয়ে দেখে ওখানে অনেকগুলো মুর্গী আছে। নিজের গুলো চেনা যায় না। সবগুলোর গায়েই

রং লাগানো। তখন সে নিজের ঢংএ নিজের মুর্গী জোড়াকে ডাকল। ডাকার সঙ্গে সঙ্গে তার এক জোড়া মুর্গী সুড় সুড় করে তার কাছে এসে পায়ের কাছে ঘোরাঘুরি করতে লাগল।

রামদাস চমকে উঠল। কি-যেন ভেবে বলল, "দূ-র এক-টাও ভাল জাতের মুর্গী নেই। যাই।" বলে বেরিয়ে গেল দীনুর বাড়ি থেকে। ওর যাওয়ার পর দীনুর যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। সে ভাবল। রামদাস সত্যি খুব নেশা করেছে। কিছুই বুঝতে পারছে না। কিছুই টের পায়নি।

পরের দিন রামদাস নিজের বিড়াল নিয়ে দীনুর বাড়ির কাছে তাক করে বসে ছিল। সেদিনও দীনু মোরগের গলায় শুঁটকীর মালা পরিয়ে ছেড়ে দিল পাড়ায়। একটু যেতেই রামদাস বিড়ালটাকে শিখিয়ে পড়িয়ে ছেড়ে দিল। বিড়াল তৎক্ষণাৎ গিয়ে মালা পরা মুর্গীর গলায় কামড় দিয়ে মেরে ফেলল।

এই ঘটনা দীনুর নজরে পড়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি গাঁয়ের বিচারকের কাছে গিয়ে অভিযোগ করল। বলল যে এই রামদাসের বিড়ালের জন্যই গাঁয়ের মুর্গী-গুলো সব গায়েব হয়ে যাচ্ছে।

একথা শুনে বিচারক রামদাসকে ডেকে বলল, "তোমার বিড়াল গাঁয়েব মুর্গী-

গুলোকে শেষ করে দিচ্ছে। এর জন্য তুমিই দায়ী।"
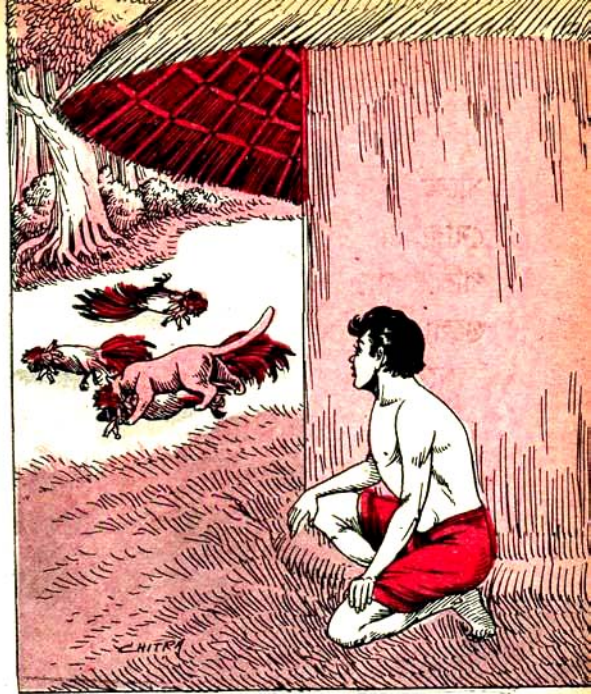
"আজ্ঞে, আমার বিড়াল কোনদিন কোন মুর্গীকে মেরে ফেলে নি। আমার বিড়াল শুধু শুঁটকী মাছ খায়।" রামদাস বলল।

"না হয় আমার মোরগের গলায় শুঁটকীর মালা ছিল সেজন্য কি বিড়াল আমার মোরগকে মেরে ফেলবে?" দীনু চৌধুরী বলল।

বিচারক বলল, "সে কি মোরগের গলায় শুঁটকীর মালা কেন?" দীনু ঘাবড়ে গেল। কি বলবে ভেবে পেল না। রামদাস বলল, "আজ্ঞে এইখানেইতো আসল রহস্য। এই রহস্য উদ্ঘাটিত হলেই ধরা পড়বে কে

মুর্গী চুরি করছে। আর গাঁয়ের মুর্গীগুলো যাচ্ছে কার বাড়ি। দীনু চৌধুরী তার মোরগের গলায় শুঁটকী মাছের মালা পরিয়ে গাঁয়ে ছেড়ে দেয়। গাঁয়ের মুর্গী-গুলো শুঁটকীর আশায় আশায় ওগুলোর পিছনে পিছনে দীনুর বাড়িতে ঢোকে। মুর্গী দিয়ে মুর্গী জোগাড় করে দীনু। এ এক অদ্ভুত কৌশল তার। দীনু চৌধুরীর বুদ্ধি আছে বলতে হবে।"

"এ সব মিথ্যে কথা। আপনি এর কথা বিশ্বাস করবেন না।" দীনু চৌধুরী চিৎকার করে উঠল।

"সেদিন আমার দুটো মোরগ হারিয়েছে। আপনারা আমার সঙ্গে আসুন, এক্ষুণি প্রমাণ করে দিচ্ছি।" রামদাস আবেদন করল।

বিচারক সদলবলে গেল দীনু চৌধুরীর বাড়ি। সেখানে নানা রঙের মোরগ মুর্গী দেখতে পেল সবাই। সকলের সামনে রামদাস নিজের বিড়ালটাকে ছেড়ে দিল।

বিড়ালকে দেখে দুটো বাদে প্রত্যেকটা মুর্গী ভয়ে পালিয়ে গেল। শুধু দুটো বিড়ালের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বিচিত্র আওয়াজ করতে লাগল। এ দৃশ্য দেখে প্রত্যেকে বুঝতে পারল যে মোরগ দুটো রামদাসের পোষা। সেই জন্যই ওগুলো বিড়ালকে ভয় পাচ্ছে না।

তখন রামদাস বলল, "দেখছেনতো কত মুর্গী। এদের গায়ে রং লাগানো আছে তাই যার মুর্গী সে চিনতে পারছে না। প্রত্যেকটা মুর্গীর গায়ে দীনু চৌধুরী রং লাগিয়েছে।"

ঝড়ের বেগে এই খবর ছড়িয়ে পড়ল গাঁয়ে। যাদের যাদের মুর্গী হারিয়েছিল প্রত্যেকে দীনুর বাড়িতে ছুটে এল। মুর্গীগুলোকে ধুয়ে রং ছাড়িয়ে যে যার মুর্গী বাড়ি নিয়ে গেল।

বিচারক দীনু চৌধুরীকে মুর্গী চুরির অপরাধে কঠিন শাস্তি দিল।
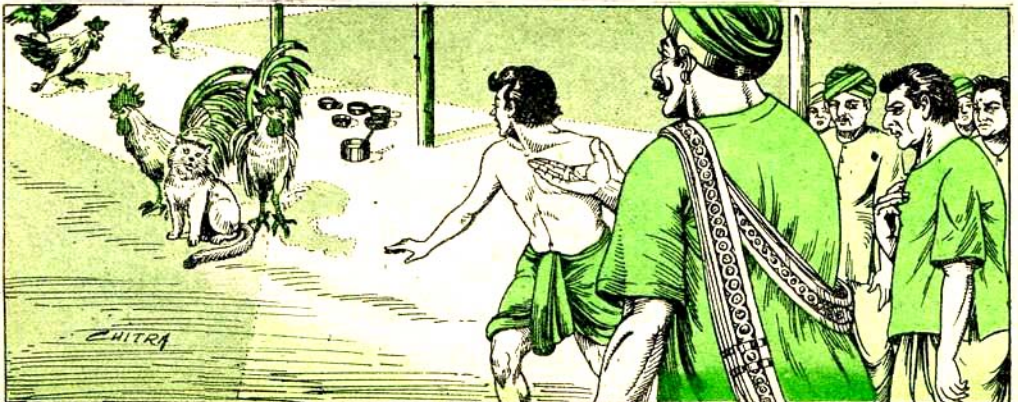
মাঝ-রাতের কেনাবেচা

মমতার স্বামী মারা যাওয়ার পর সে ভেবে পেল না কি করবে। কিভাবে পেট চলবে। শেষে সে ঠিক করল শহরে গিয়ে তেলেভাজা বিক্রী করে দিন কাটাবে। ঠিক করল ভোর রাত্রে উঠে তাড়াতাড়ি সব বানিয়ে সকালে বিক্রি করতে বসবে।

মাঝ রাত্রে পাশের বাড়ির মোরগের ডাক শুনে মমতা ভাবল ভোর হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি উঠে পিঠে ফুলুরি বানাতে যা যা লাগে সব গুছিয়ে উনান ধরাল। রান্নার গন্ধে চার দিকের হাওয়া ভরে গেল।

"মা, মনে হচ্ছে তুমি এখানে নতুন ব্যবসা করতে বসেছ?" বলতে বলতে এক বুড়ো সেখানে এল।

"আজ্ঞে হ্যাঁ। গরম গরম ফুলুরি দেব?" বলে একটা পাতায় কয়েকটা ফুলুরি খেতে দিল। কিছুক্ষণ পরে পিঠেও তাকে খেতে দিল।

বুড়োর খাবার সময় আরও চারজন সেখানে এসে বাদ বাকি যা কিছু ছিল মমতার দোকানে সব খেয়ে নিল। খাওয়ার পর ওরা বলল, "মা, তোমার রান্নার হাত খুব ভাল। প্রত্যেক দিন তুমি এই সময় পিঠে ফুলুরি বানাও, আমরা এসে খেয়ে যাব। আমাদের ঘুম পায় না।"

তাদের মধ্যে একজন মমতাকে বলল, "কাল তুমি রুটি আর মুর্গীর মাংস বানাবে। তবে একটা কথা মনে রেখো, এসব কথা অন্য কাউকে বল না।"

ওদের কথা শুনে মমতা মনে মনে ভেবে নিল যে এরা সকলের সামনে খেতে লজ্জা পায়। গোপনে সব কিছুই খেতে চায়।

অনিমা দেবী

এসব ভেবে সে ওদের বলল, "ঠিক আছে কাউকে বলব না। আপনারা কি বলতে চান আমি বুঝতে পেরেছি।"

খেয়েদেয়ে ওরা যে যার খেয়াল খুশী মত পয়সা দিয়ে চলে গেল। মমতা পয়সা গুণে অবাক হল। সে যা আশা করেছিল পেল তার পাঁচ গুণ বেশি।

এই ঘটনার অনেক পড়ে সূর্য উঠল। মমতা ঠিক করল কষ্ট হলেও সে প্রত্যেক দিন এই সময়েই ঘুম থেকে উঠে ফুলুরি আর পিঠে বানাবে।

পরের দিন ভোর রাত্রের অনেক আগেই মাঝরাত্রে মমতা উঠে আগে থেকে কিনে রাখা দুটো মুর্গীর মাংস আর আটার রুটি বানিয়ে ওদের অপেক্ষা করল। ঐ পাঁচজন সেদিনও এল এবং খেয়ে যে যার ইচ্ছেমত পয়সা দিয়ে চলে গেল। সেদিনও মমতা হিসাব করে দেখল যে তার অনেক লাভ হয়েছে। এইভাবে তার কেনাবেচা চলতে লাগল। মমতার বাড়ির কাছেই বিরাট এক বাড়ি ছিল। সেটা ছিল এক ব্যবসা-দারের। লোকটা ভীষণ কৃপণ। এক রাত্রে তার নাকে গেল ভাল ভাল খাবারের সুগন্ধ। কোত্থেকে গন্ধ আসছে তা অনুমান করার জন্য সে গেল ছাদে। সে দেখতে পেল মমতা রান্নায় খুব মন দিয়েছে। ব্যবসাদারটির অবাক লাগল। এই অন্ধকার রাত্রে কার জন্য করছে? এই প্রশ্ন ভাবতে
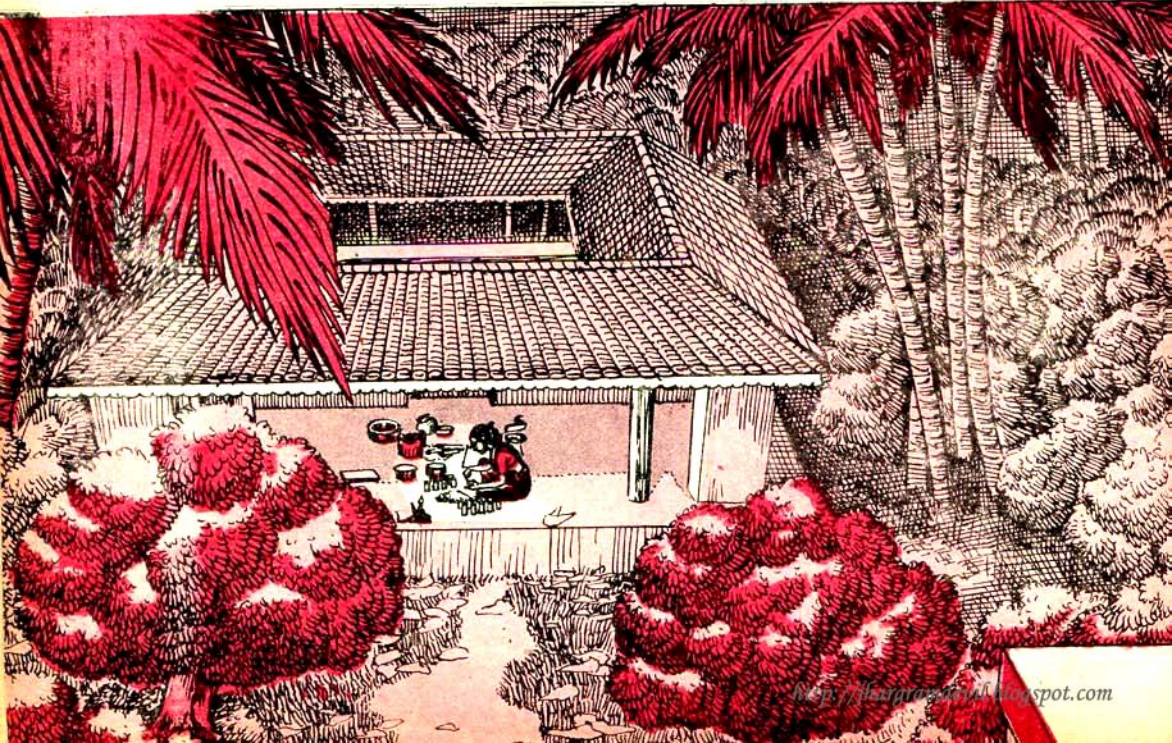
ভাবতে লক্ষ্য করল কয়েকজন লোক মমতার কাছে আসছে। এত রাত্রে লোকগুলোকে আসতে দেখে এক দিকে যেমন ভয় করল অন্য দিকে তেমনি তার কৌতুহলও জাগল। পাঁচ জন এল, খেল, পয়সা দিয়ে চলে গেল। এ সবই ঘটে গেল ওর চোখের সামনে।

ওদের চলে যাবার পর মমতা পয়সা গুণে নিল। ব্যবসাদারটির ভীষণ লোভ হল। ভাবল, "প্রত্যেকদিন এতগুলো পয়সা দিয়ে যায় তাহলে তো এর অনেক লাভ হয়। ওকে ছলে বলে তাড়িয়ে আমি ঐ ব্যবসা করি।"

পরের দিন দুপুরে মমতার ঘরে এসে ব্যবসাদারটি বলল, "তোমাকে যে দেখতো সেই তোমার রূপে মুগ্ধ হত আর আজ তোমার সেই রূপ কোথায়? আগুনের কাছে বসে রান্না করে পিশাচদের খাওয়ালে কি রূপ আর শরীর থাকে? থাকে না।"

মমতা অনেক ভেবেও ব্যবসাদারটির কথা ঠিক বুঝতে পারল না। ফ্যাল ফ্যাল করে তার দিকে তাকিয়ে রইল। তার সেই চাউনি দেখে ব্যবসাদারটি বলল, "তোমার সেই উজ্জ্বল চাউনি হারিয়ে গেছে। পিশাচদের মাঝরাত্রে বসিয়ে খাওয়ালে কখনও রূপ থাকে?"

একথা শুনেও মমতা হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে রইল। তখন ব্যবসাদার আস্তে আস্তে বলল, "তোমাকে লোকে দেখেই
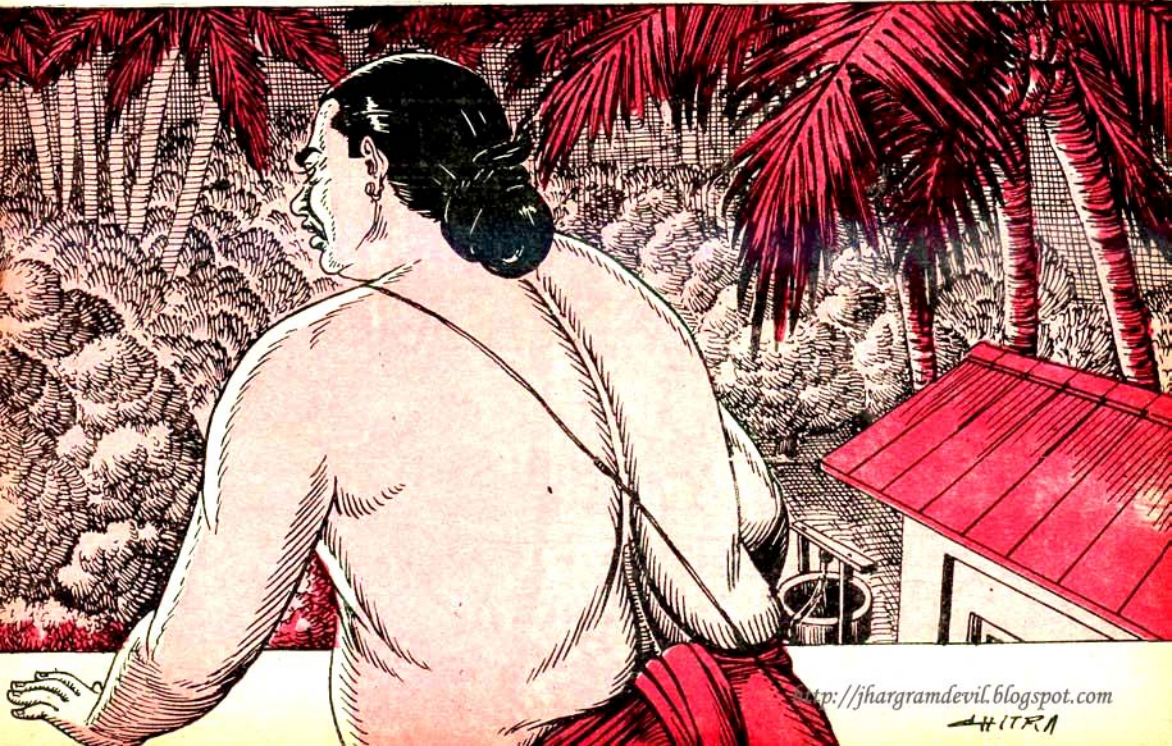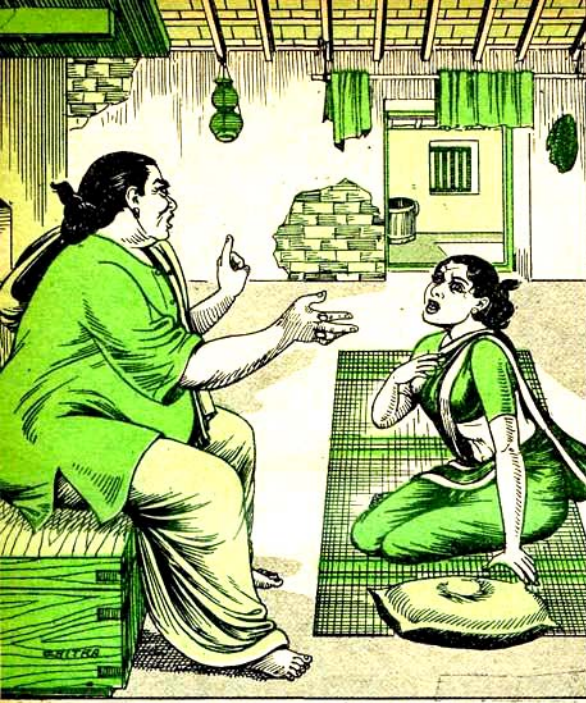
বুঝবে যে তোমার গায়ে পিশাচদের হাওয়া লেগেছে। মাঝ রাতে কয়েকজনকে তুমি রান্না করে খাওয়াও না ? মাংস আর রুটি তাদের রান্না করে দাও কিনা বল ?"

"এতে অপরাধের কি আছে ? ওরা যা খেতে চাইবে তা রান্না করে খাওয়াব না ?" মমতা সহজ সরলভাবে ব্যবসাদারকে পাল্টা প্রশ্ন করল।

"এখন তুমি ওদের রান্না করে খাওয়াচ্ছ খাওয়াও। তবে মনে রেখ একদিন ঐ পিশাচগুলো তোমাকেই পুড়িয়ে খাবে। আমি তোমার ভালর জন্যই যা ভাল মনে করেছি বলেছি। এখন তোমার যা মন চায় তাই কর।" ব্যবসাদার বলল।

"অত রাতে যারা আমার জিনিস খেতে আসে তারা পিশাচ ?" মমতার প্রশ্ন।

"বিশ্বাস হচ্ছে না তো ? তাহলে শোন বলি। এই ঘরে তোমার আসার আগে থাকত এক বুড়ি। একদিন ঐ পিশাচগুলো ওকে পুড়িয়ে খেল !" সে বলল।

ব্যবসাদারটি কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে পরে বলল, "আমি বলি কি জান, জীবনের চেয়ে তো পয়সা বড় নয়। তুমি প্রাণ বাঁচাতে চাও তো এখান থেকে পালাও। কাউকে কোন কথা না বলে চলে যাও।"

মমতা আর কালমাত্র বিলম্ব না করে সেই দিনই সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে দূরের এক গ্রামে চলে গেল।

ব্যবসাদারটি মহা আনন্দে বাড়ি ফিরে বউকে সব ঘটনা জানাল। তাকে বলল, "একটা কাজ করবে ? অনেক টাকা হবে। সোনা দিয়ে তোমাকে মুড়ে দেব।"

"কি করব ?" বলল ব্যবসাদারের বউ।

ব্যবসাদারটি আরও কাছে এসে বলল, "ঐ মমতার জায়গায় আজকের রাতটা তুমি বসে দেখ না। বেশ ভালই লাগবে।"

"ওরে বাবা, না না আমি ওর জায়গায় বসতে পারব না। অত শখ থাকে তো তুমিই বস না।" ব্যবসাদারটির বউ বলল।

সেদিন রাত্রেই মমতার জায়গায় ব্যবসাদারটি বসে গেল। কিছুক্ষণ পরে ওরা

এল। এদিক ওদিক তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "এখানে যে মেয়েছেলেটি বিক্রি করতে বসত সে গেল কোথায়?"

"সে শ্বশুর বাড়ি চলে গেছে। তোমাদের জন্য আমিই বানাচ্ছি।" ব্যবসাদারটি বলল।

ফুলুরি আর পিঠে দেখে ওরা ভীষণ চটে গিয়ে বলল, "আজকে যা করেছ করেছ। কাল যদি মুর্গীর মাংস না কর তো খুব খারাপ হবে।" ওদের কথা শুনে ব্যবসাদারটির মনে দুটো প্রশ্ন জাগল। মমতা যে কোন মুহূর্তে এসে পড়বে কিনা, ওরা পয়সা না দিয়ে যদি চলে যায়? এসব ভেবে সে বলল, "মুর্গীর মাংস আর রুটি বানিয়ে রাখতে পারি, যদি তোমরা আগে পয়সা দিয়ে যাও। তোমরা যদি পয়সা না দিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যাও।"

একথা শুনে ওরা তেলে বেগুনে চটে গেল। বলল, "আগেভাগে পয়সা না দিলে মাংস বানাবে না? আমরা পয়সা না দিয়ে অন্ধকারে পালাব? একথা তুমি বলতে পারলে! এতবড় সাহস তোমার। শোন তোমাকে শেষ বারের মত বলে দিচ্ছি আমরা যা যা খেতে চাইব তা ঠিকমত রেঁধে খাওয়াবে। তা না হলে এই আগুনে তোমাকে পুড়িয়ে খাব। আর যদি কোথাও পালাও তো আর রক্ষে নেই। আমরা তোমাকে সেখানে গিয়ে ঘাড় মটকে পোড়াব।"

একথা বলে ওরা পয়সা না দিয়ে হাত-পা নাড়তে নাড়তে চলে গেল।

তারপর থেকে বেচারা ব্যবসাদার প্রত্যেকদিন সেই মাঝ রাতে উঠে রান্না করে ওদের খাওয়াত। প্রত্যেকদিন তাকে ফোকটেই খাওয়াতে হত। লোকটা নাকের জলে চোখের জলে হয়ে কত যে ঠাকুরের কাছে মানত করল, যাতে মমতা ফিরে আসে। কিন্তু আজও মমতা ফিরল না।

মানত

এক গ্রামে ছিল এক কিষাণ। একবার তার বউয়ের কঠিন অসুখ করল। ওষুধে কোন কাজ হল না। তখন ঐ কিষাণ গেল মন্দিরে। মানত করল তার বউয়ের অসুখ সেরে গেলে তার যে গরুটা আছে তা বিক্রি করে সেই টাকা ঠাকুরের ভাণ্ডারে জমা দেবে। মানতের পরেই বউয়ের অসুখ সেরে গেল।

এবার কিষানের মানত পূরণ করার পালা। সে তার গরুর সঙ্গে একটা বিড়ালকেও নিয়ে গেল। হাটে যে দর জিজ্ঞেস করে তাকে বলে, "গরুর দাম এক টাকা। তবে এই বিড়াল না কিনলে এই গরু বিক্রি করতে পারব না। বিড়ালের দাম একশো টাকা।"

ক্রেতারা ভাবল গরুর দাম সাধারণত একশো টাকার বেশি হয়ে থাকে। তাই অনেক ভেবে একজন বিড়াল ও গরুকে একশো এক টাকায় নিয়ে গেল কিনে। কিষাণ পাড়ায় ফিরে গিয়ে এক টাকা ঠাকুরের ভাণ্ডারে জমা দিল। বাকি একশো টাকা দিয়ে কিষাণ একটা গরু কিনে দিন কাটাতে লাগল।

পান্তা ভাত

প্রাচীনকালে এক দেশে ছিলেন এক রাজা। তিনি ছিলেন দয়াবান ও দানশীল রাজা। দেশবাসীর অবস্থা সচক্ষে দেখার জন্য তিনি ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াতেন।

সেই দেশে ছিল এক ধনী ব্যক্তি। সে কোন দিন কাউকে এক পয়সা দান করত না। যতই দীন দুঃখী হোক না কেন কাণা কড়িও সাহায্য করতে সে চাইত না। দানের নাম শুনলেই তার জ্বর আসত।

তার স্ত্রীর কিন্তু মন কাঁদত গরিব দুঃখীর জন্য। তার স্বামী বাড়ি না থাকার সময় গরিব মানুষ কেউ এলে তাকে যথাসাধ্য সাহায্য করত।

সেদিন ছিল ঐ ধনীর জন্মদিন। চার রকম রান্না করে তাকে খাওয়ানোর সময় একটি ভিখারী এসে আর্তনাদ করল, "মা, মাগো, কিছু খেতে দিন মা, খিদের জ্বালায় মারা যাচ্ছি, মা।"

ধনী লোকটা তার কথা কানে তোলেনি। ভেবেছিল চিৎকার করতে করতে ও নিজেই চলে যাবে। তার স্ত্রী কিন্তু খুব ব্যথা পেল। তাই মুখ ফুটে কোন ক্রমেই বলতে পারল না, "যাও।"

অনেকক্ষণ ডাকার পর ভিখারী বলল, "কিগো মা, ভিক্ষে পাব না ? চলে যাব ?"

সে আশা করেছিল তার স্বামী তাকে কিছু দিতে বলবে। কিন্তু সে কোন কথাই বলল না।

তখন ধনীর স্ত্রী কি বলবে কি করবে ভেবে না পেয়ে জোরে জোরে বলল, "আমার স্বামী পান্তা ভাত খাচ্ছে বাবা। তুমি অন্য বাড়িতে যাও।"

গোপাল চৌধুরী

এ সব কিছুই ছদ্মবেশে দাঁড়িয়ে রাজা লক্ষ্য করলেন। রাজা লক্ষ্য করলেন যে ধনী লোকটা পাঁচরকম ভালমন্দসহ গরম ভাতই খাচ্ছে।

রাজা ভাবলেন, "এখন হবে না যাও।" না বলে কেন সে "আমার স্বামী পান্তা ভাত খাচ্ছে বলল?" তা রাজা অনেক ভেবেও কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পেলেন না। সেদিন বার বার একই ব্যাপার নিয়ে ভেবে রাজা কি করবেন, কেন করবেন ঠিক করতে পারলেন না।

পরের দিন রাজার লোক এসে ধনীর স্ত্রীকে রাজা ডেকেছেন বলে নিয়ে গেল রাজার কাছে। না জানি তার স্ত্রী কোন্ অপরাধ করেছে রাজার কাছে। একথা ভেবে ধনীও গেল তাদের সঙ্গে স্ত্রীর পেছনে পেছনে।

রাজা বললেন, "কাল তোমার স্বামীকে ভাল ভাল খাবার খেতে দিয়ে ভিখারীকে কেন বললে পান্তাভাত খাচ্ছে? এইভাবে মিথ্যা কথা বলার তাৎপর্য কি?"

ধনীর স্ত্রী ঐ কথায় একটু হেসে বলল, "মহারাজ, আমি তো কোন মিথ্যা কথা বলিনি। পান্তাভাত বলতে আমি জানাতে চেয়েছি পূর্বজন্মের পুণ্যের ফলে এজন্মে প্রাপ্ত সম্পত্তি। এই সম্পত্তির আনন্দেই ডুবে আছে আমার স্বামী। আগামী জন্মের জন্য সে কোন দানধর্ম করছে না। পূণ্যের খাতে কিছুই জমা পড়ছে না। ভিখারীর আর্তনাদ শুনে আমি সেই কথাই বোঝাতে চেয়েছি। আপনি অন্য অর্থে বুঝেছেন।"

তার কথায় বিস্মিত হয়ে রাজা ধনীকে বললেন, "শুনলেতো। অন্তত এখন থেকে বাকি জীবনটা দানধর্ম করে কাটাও।" বলে রাজা ধনীর স্ত্রীকে রেশমী শাড়ী উপহার দিয়ে বিদেয় করলেন।

তারপর থেকে ধনী দানধর্ম করে জীবন যাপন করতে লাগলেন।
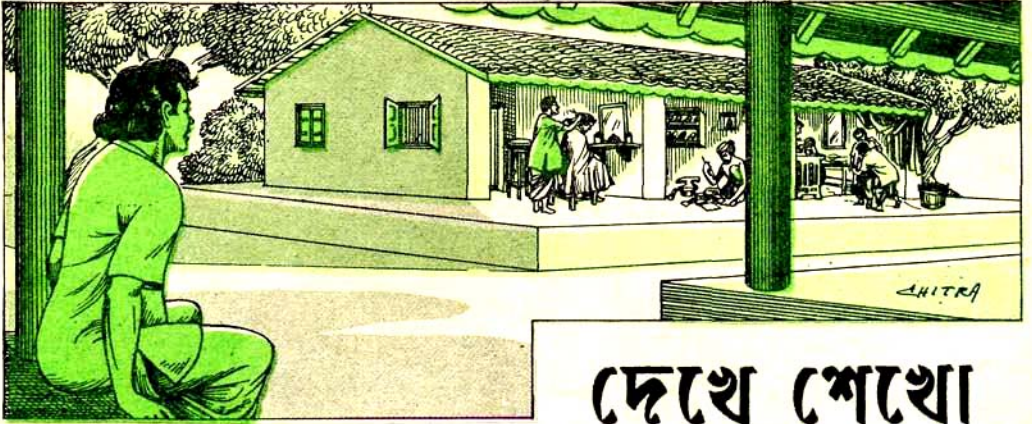
দেখে শেখো

এক দেশে ছিল এক মা আর তার ছেলে। ছেলের নাম ভোলা। মা ওকে খুব আদর দিয়ে মানুষ করার চেষ্টা করত। একদিন তার মা তাকে বলল, "বাবা, এত বড় হয়েছিস, আজ বাদে কাল তোকে বিয়ে করতে হবে। তোর বউকে তুই কাজ কর্ম না করলে খাওয়াবি কি করে?"

"আমিতো কোন কাজই শিখিনি মা, কি কাজ করব?" বলল ভোলা।

"কেউতো পেট থেকে শিখে আসে না। সব দেখেশুনেই শেখে। ঐ দেখো আমাদের বাড়ির সামনে জুতো সেলাই করার লোক আছে, তার ডান দিকে আছে চুল কাটার লোক আর বাঁ দিকে আছে কাপড় জামা সেলাই করার কারিগর। ওদের কাজ লক্ষ্য করলেই শিখতে পারবে। আমি আর কতদিনই বা বাঁচব?" বলল ভোলার মা।

মার এই উপদেশ ভোলার মগজে ঢুকল। ভোলা প্রত্যেকদিন জুতো সেলাই, কাপড় সেলাই ও চুল কাটার কাজ সারাদিন লক্ষ্য করতে লাগল।

"সারা দিন ধরে এখানে বসে বসে কি করছিস বাবা? দাওয়ায় বসে থাকলে কি পেট ভরবে?" মা বলল।

"তুমি যে বলেছিলে মা, দেখে শিখতে।" বলল ভোলা।

একবার লক্ষ্য করল ঐ তিনটে দোকানে রাজ্যের লোক ভেঙ্গে পড়েছে। জানতে পারল যে ঐ দেশের রাজার একমাত্র পুত্রের জন্মদিন উপলক্ষ্যে রাজা সবাইকে নিমন্ত্রণ করেছেন। অনেক সাধ্য সাধনার

রাখালদাস রায়

ফলে রাজার একমাত্র পুত্র হওয়ায় রাজা ঘটা করে তার জন্মদিন পালন করতে চান। রাজা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে নিমন্ত্রণ করে-ছেন। প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাও আছে। বিজয়ীকে পুরস্কার দেওয়া হবে।

সেই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্য ভোলাও গেল। খাওয়া দাওয়ার পর নানা ধরণের প্রতিযোগিতা হল। তারপর শুরু হল কথার প্রতিযোগিতা। নানা প্রশ্ন উঠল। তার জবাবও শোনা গেল।

শেষে ভোলাও প্রশ্ন করল, "আমি তিনটে প্রশ্ন করতে চাই। আমাকে কি অনুমতি দেওয়া হবে?" অনুমতি পেল।

"একজন নিচের দিকে তাকিয়ে কাজ করে, আর একজন উপরের দিকে তাকিয়ে কাজ করে, আর অন্যজন একবার উপরের দিকে আর একবার নিচের দিকে তাকিয়ে কাজ করে। এই তিনজন কি কি কাজ করে বলুন।" ভোলা প্রশ্ন করল।

অনেকক্ষণ পরে একজন পণ্ডিত বলল, "নিচের দিকে তাকিয়ে যে কাজ করে সে সাধু, উপরের দিকে যে তাকিয়ে থাকে সে ভক্ত আর উপরের দিকে ও নিচের দিকে যে তাকায় সে জাগতিক সুখ চায়।"

ভোলার এই জবাব মনে ধরল না।

"তাহলে আমি আর পারব না। এবার প্রশ্ন কর্তাকেই জবাব দিতে অনুরোধ করছি।" প্রায় প্রত্যেকেই এই কথা বলল।

"নিচের দিকে তাকিয়ে যে কাজ করে সে জুতো সেলাইয়ের কাজ করে, তার নজর মানুষের পায়ের দিকে। মানুষের মাথার উপর নজর রাখে যে সে চুল ছাঁটার কাজ করে। আপাদমস্তক লক্ষ্য করে কাপড় জামা সেলাই করার কারিগর।" ভোলা বলল।

এই জবাবে সবাই খুশী হল। তার জবাবের ফলে সে পেল পাঁচশো টাকা।

ভোলা ঐ টাকা মার হাতে দিয়ে বলল, "মা, এই নাও দেখে শেখার পুরস্কার।"
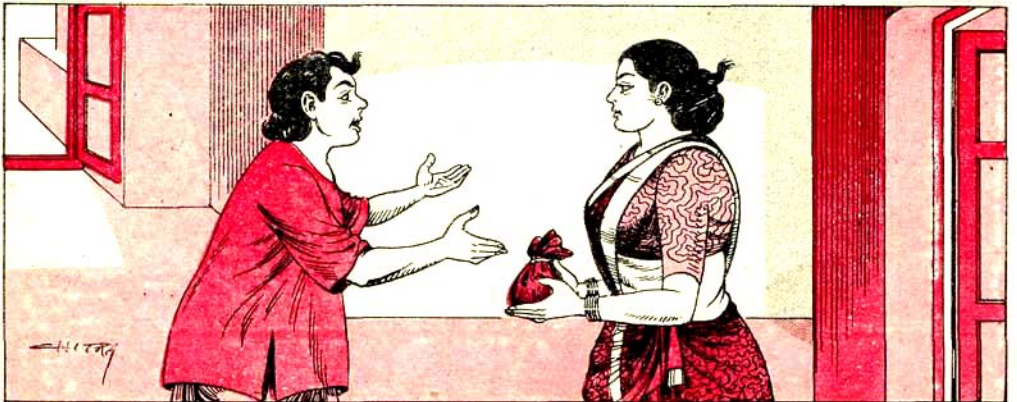
বিচিত্র ভেট

অত্যন্ত দরিদ্র এক ব্রাহ্মণ মালব দেশের রাজা ভোজরাজ সম্পর্কে অনেক রকমের কথা শুনেছিল। জানতে পারল যে ভোজরাজের সভাকবি কালিদাস প্রত্যেক দিন কবি ও পণ্ডিতদের দানধর্ম করার জন্য, সম্মানী দেওয়ার জন্য রাজাকে বলে থাকেন। এবং তার কথা অনুযায়ী রাজা বিভিন্ন পণ্ডিত বা কবিকে সম্মানিত করে থাকেন। ঐ ব্রাহ্মণ কালিদাসের কাছে গিয়ে নিজের দুরবস্থার কথা বিস্তারিত ভাবে জানাল। আরও জানাল যে সে লেখাপড়া কিছুই জানে না। রাজা শুধু পণ্ডিতদের পুরস্কার দিয়ে থাকেন। তাকেও যে কোন ভাবে কিছু পাইয়ে দিতে হবে। পাইয়ে না দিলে তার পরিবারের সবাই না খেতে পেয়ে মারা যাবে।

কালিদাস ব্রাহ্মণকে বুঝিয়ে বললেন, "আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। তবে তুমি কিন্তু খালি হাতে রাজার কাছে যেয়ো না। কিছু না কিছু নিয়ে যাবে। ভেট নিয়ে রাজার দর্শনের জন্য বাইরে অপেক্ষা করবে। রাজা যখন ডেকে পাঠাবেন তখন তুমি রাজার সামনে ভেট রাখবে। তুমি কিন্তু রাজার সামনে মুখ খুলবে না। তার পর তোমার ভাগ্যে যা থাকে তাই হবে।"

পরদিন ঐ ব্রাহ্মণ একটা আখের টুকরো জোগাড় করে নিয়ে পাগড়ীর ভিতরে গুঁজে রাজমহলের সামনের একটা বারান্দায় বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

রাজার ডাক আসার আগে বেচারার ঘুম পেয়ে গেল। অনেক চেষ্টা করেও সে আর বসে থাকতে পারল না। ঘুমিয়ে

বোম্মানা বিশ্বনাথম্

পড়ল। সযত্নে পাগড়ীটা মাথার নিচে রাখল।

ঐ ব্রাহ্মণের চেয়ে গরিব অন্য একজন, ব্রাহ্মণের মাথা সরিয়ে পাগড়ী থেকে আখের টুকরো বের করে সেখানে আধ-পোড়া কাঠ রেখে দিল।

ব্রাহ্মণ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। এ সবের কিছুই সে একটুও টের পেল না।

সুযোগ বুঝে একবার কালিদাস রাজাকে বললেন, "মহারাজ, আপনার দর্শনপ্রার্থী একজন মহাপণ্ডিত অনেক দূর থেকে এসে আপনার ডাকের অপেক্ষা করছেন। বেচারা আবার আজকে মৌনব্রত পালন করছেন।"

রাজা তৎক্ষণাৎ তাকে ডেকে পাঠালেন। রাজার লোক বাইরে এসে ঐ ব্রাহ্মণকে প্রশ্ন করল, "মশাই, আপনি কি রাজার দর্শনপ্রার্থী? আপনি কি মহাপণ্ডিত?" ব্রাহ্মণ মাথা নেড়ে জানাল যে সেই মহা-পণ্ডিত। তখন তাকে ভিতরে নিয়ে যাওয়া হল।

ব্রাহ্মণ রাজার সামনে পাগড়ী খুলে দেখে আধপোড়া কাঠ আছে। সে নিজেই চমকে উঠল কিন্তু কোন কথা বলল না। ভাবল দারিদ্রদেবী তার পিছু ছাড়বে না।

আধপোড়া কাঠের টুকরো দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল। রাজাও ভীষণ রেগে গিয়ে অগ্নিদৃষ্টিতে কালিদাসের দিকে তাকালেন।

কবি কালিদাস ব্রাহ্মণের মূর্খতায় বিরক্ত হলেন মনে মনে। কিন্তু মুখে সেই বিরক্তি কোন কথার মাধ্যমে প্রকাশ করলেন না। মনে ছিল তাঁর ব্রাহ্মণের হাতে কিছু দেওয়ার কথা। রাজার কাছ থেকে কিছু পাইয়ে দেবার কথা। "মহারাজ ব্রাহ্মণের এই বিচিত্র ভেট আনার পেছনে একটা গভীর তাৎপর্য আছে। তা হল ঃ

দগ্ধম্ খাণ্ডব মর্জুনেন চ বৃথা
দিব্য দ্রুমৈর্ভূষিতম্,
দগ্ধা বায়ুসুতেন হেমরচিতা
লঙ্কাপুরী স্বর্গভূঃ

দগ্ধ স্সর্ব সুখাস্পদশ্চ মদনো
হা! হা! বৃথা সম্ভূনা;
দারিদ্রম্ ঘনতাপদম্ ভূবি নৃণাম্
কেনাপি নো দহ্যতে।

(দিব্যবৃক্ষে ভরা খাণ্ডব বনকে অর্জুন অযথা পুড়িয়ে ফেললেন, সোনায় নির্মিত লঙ্কাপুরী হনুমান অহেতুক পুড়িয়ে ফেলল, সমস্ত সুখদানকারী মন্মথকে শিব অকারণে ভস্ম করে ফেললেন কিন্তু মর্তভূমির মানুষ যে দারিদ্রের জ্বালায় জর্জরিত তাকে কেউ পুড়িয়ে ছাই করে ফেলতে পারল না।)

এই শ্লোক শুনিয়ে মহাকবি কালিদাস রাজাকে বললেন, "হয়ত এই পণ্ডিত আপনাকে মনে করেন যে আপনিই এই দারিদ্রদেবীকে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলবেন।"

এই কথাগুলো শুনে রাজা ও দরবারের অন্যেরা খুশী হল। রাজা ঐ ব্রাহ্মণকে অনেক ধনসম্পত্তি উপহার দিয়ে বিদায় দিলেন। ব্রাহ্মণ বুঝতে পারল না একটা ব্যাপার। কালিদাস এমন কি উচ্চারণ করেছেন। যার জন্য রাজা তাকে এত ধনসম্পত্তি উপহার দিলেন। ভাবতে ভাবতে ব্রাহ্মণ যাবার সময় পিছন ফিরে কালিদাসের দিকে তাকাচ্ছিল।

রাজা তার ঐ ভাব দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "ব্রাহ্মণ বার বার পিছন ফিরে তাকাচ্ছে কেন? কি দেখতে দেখতে যাচ্ছে?"

"মহারাজ, সে দেখছে দারিদ্রদেবী তাকে অনুসরণ করছে কিনা।" কালিদাস তৎক্ষণাৎ বানিয়ে বলে দিলেন।

"তাহলেতো এই ব্রাহ্মণ সত্যি খুব জ্ঞানী পণ্ডিত। মৌন না হলে ভাল হত। অনেক কিছু শোনা যেত।" রাজা ভোজরাজ মনে মনে বললেন।

রাজা ভোজরাজ টের পেলেন না যে মহাকবি কালিদাস তাঁকে ভুল অর্থ বুঝিয়েছেন।

হাবা

লেবাননে হনি ও মরিয়ম নামে এক দম্পতি ছিল। হনীর স্বভাব চরিত্র ভালই ছিল। ছিল না প্রবল স্মৃতিশক্তি আর কাজের উদ্যোগ।

তবে মরিয়ম ছিল খুব কাজের। বড়-লোকদের বাড়িতে ঝি-গিরি করে স্বামীর পেট চালাত। স্বামীকে সে প্রত্যেকদিন কত করে, কাকুতি মিনতি করে বলত কোথাও কাজ খুঁজে নিতে।

হনী সারাদিন ঘরে বসে শুধু খায় আর ঘুমায়।

একদিন মরিয়ম হঠাৎ অসুখে পড়ল। সেদিন সে কাজে যেতে পারল না। হনীর উপর তার খুব রাগ হল। সে বলল, "তোমাকে আজ যে কোনভাবে কাজ খুঁজে নিতে হবে। আর তা না পারো তবে গ্রাম প্রধানের কাছে গিয়ে গাধা চরানোর কাজ চেয়ে নাও।"

পরের দিন সকালে হনী গ্রাম প্রধানের বাড়িতে গেল। গ্রাম প্রধান জানত যে হনী অত্যন্ত আলাভোলা এবং কুঁড়ের রাজা। তার বউ কাজ করে রোজগার করে খাওয়ায়।

হনীর উপর গ্রাম প্রধানের দয়া হল। সে তার হাতে একটা স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে একটা গাধা কিনে আনতে বলল।

হনী সেই স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে বিরুট নগরে গিয়ে একটা গাধা কিনে আনতে রওনা হয়ে গেল।

গ্রাম প্রধান প্রত্যেকদিন হনীকে দিয়ে কাজ করিয়ে তার প্রাপ্য পয়সা দিনেরটা দিনেই দিয়ে দিত।

আরব দেশের লোককথা

একদিন গ্রাম প্রধান হনীকে বলল, "তুমি বিরুট থেকে এক বস্তা চাল নিয়ে এস।" কোন দোকান থেকে আনতে হবে তাও বলে দিয়েছিল গ্রাম প্রধান।

হনীর সেদিন ইচ্ছে করল না বিরুট যেতে। সে ভাবল গাধাকে ছেড়ে দিলেই তো হয়, সে কি আর এক বস্তা চাল আনতে পারবে না।

হনী গাধার কানের কাছে মুখ রেখে বলল, "শোন, তুমি একটা কাজ কর। বিরুটে সব চেয়ে বড় চালের দোকান থেকে ভাল দেখে এক বস্তা চাল এনে আমাদের মালিকের বাড়িতে দিয়ে এস। বুঝলে তো ?"

গাধা তার অভ্যাস মত মাথাটাকে ওপর নীচে নাড়ল।

কিন্তু হনী ভাবল গাধা ওই কাজ করতে রাজী হয়েছে।

তারপর সে গাধার মাথায় একটা পাগড়ী বেঁধে দিল। আর তার ভিতরে গুঁজে দিল ঐ মুদ্রা। তারপর গাধাটাকে হেঁকে দিল। কিছুক্ষণ পরেই গাধাটা তার নাগালের বাইরে চলে গেল। সে বাড়ি ফিরে এল।

অসময়ে স্বামীকে ফিরতে দেখে মরিয়ম বিস্মিত হল। সে বলল, "তুমি বিরুট যাও নি ? তোমার গাধাটা কোথায় ?"

"গাধাটা আমার খুব বুদ্ধিমান। সে নিজেই রাজী হয়েছে বিরুট থেকে মালিকের

জন্য খুব ভাল দেখে এক বস্তা চাল আনতে।" হনী বলল।

"তোমার বুদ্ধির কাঁথায় আগুন। মগজে যে তোমার এতটা গোবর ভরা আছে কে জানত! যাও, তাড়াতাড়ি ওই গাধাটাকে খুঁজে নিয়ে এস। গাধা এবং চাল ছাড়া তুমি ঘরে ঢুকেছ কি দেখবে।" মরিয়ম কড়া সুরে বলল।

হনী বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। টেনে ছুটতে লাগল বিরুটের দিকে। অনেকক্ষন পরে সে হাঁপাতে হাঁপাতে বিরুটে এসে পৌঁছাল। সেখানকার বড় চালের দোকানে গিয়ে দোকানদারকে সে জিজ্ঞেস করল, "আমার গাধা আপনার কাছে চাল কিনতে এসেছিল? এখনও ফিরল না তাই খোঁজ নিচ্ছি।"

একটা অপরিচিত লোকের মুখে অদ্ভুত কথা শুনে চালের দোকানদার হনীর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বুঝল যে লোকটা হাবা। সে বলল, "হ্যাঁ, একটা গাধা আমার দোকানে এসেছিল তবে সে তো আমার দোকানের চাল পছন্দ করেনি? সে তো ওই পাশের দোকানে চলে গেল।" বলে সে পাশের একটা দোকানের দিকে তাকিয়ে ইশারা করল।

হনী তাড়াতাড়ি পাশের দোকানদারের কাছে গেল। ইতিমধ্যে আগের দোকান-দার তাকে ইশারায় কি যেন বলে দিল। হনী তার কাছে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে জিজ্ঞেস করল, "কি চান?"

হনী তাকে বলল, "আমার গাধা আপনার কাছ থেকে চাল কিনে নিয়ে গেছে?"

"এসেছিলো তো! তবে সে তো আমাদের চাল পছন্দ করেনি। বিরুটের চাল তার পছন্দ না হওয়ায় সে জাফা চলে গেছে।" ওই দোকানদার বলল।

হনী খুব ঘাবড়ে গেল। গাধা আর চাল না নিয়ে ফেরার উপায় নেই। আবার জাফা যাবার পয়সাও নেই কাছে। সে তখন একটা দোকানদারের কাছ থেকে কিছু ধার করে জাফার দিকে রওনা হল।

জাফায় গিয়ে এক এক করে বহু দোকানদারকে জিজ্ঞেস করল কিন্তু কেউ তাকে গাধার কোন খোঁজ দিতে পারল না। শেষে সেখানকার সব থেকে বড় দোকানদারের কাছে গিয়ে বলল, "আমার মালিকের গাধা আপনার কাছে এসেছে চাল কিনতে ?"

ওই দোকানদারটা সেখানকার বিচারকের ওপর চটা ছিল। সে ভাবল হনীকে দিয়ে ওই বিচারককে একটু অপদস্থ করবে। সে সস্নেহে দরদী গলায় হনীকে বলল, আপনার গাধা আমার দোকানে এসেছিল ঠিক, চালের দরদামও করল, ওকে দেখে অনেক লোক জমে গিয়েছিল। আপনার গাধার বুদ্ধি দেখে এখানকার লোক তাকে ধরে অনুরোধ করে প্রধান বিচারপতি বানিয়ে দিল। হাজার হাজার মানুষের অভিযোগ আছে। সব তাকে শুনতে হবে। বিচার করতে হবে। এতক্ষণে সে হয়ত মানুষের রূপ ধারণ করে বিচারালয়ে প্রধান বিচারপতির আসনে বসে লোকের অভিযোগ শুনে তার বিচার করছে।"

দোকানদারটা হনীকে নিয়ে কিছুদূর গিয়ে ওই আদালত দেখিয়ে দিল।

দেখিয়েই দোকানদার কেটে পড়ল। পথের দাঁড়িয়ে যেন হনী পড়ল এক মহা সমস্যায়। নতুন শহর। নতুন দোকান। চেনা নেই। অপরিচিত মানুষ।

গাধা যখন অতবড় সম্মান পেয়ে গেছে তখন তাকে এমনি ডাকলে কি আর আসবে? না। খুঁজে খুঁজে সে বাজারে গিয়ে তার গাধার সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য মূলো কিনে নিল। সে মূলো কিনে এনে আদালতে ঢুকতে গেল। আদালত প্রাঙ্গনের দিকে যত এগোতে যাচ্ছে তত তার হাঁটু কাঁপে। লোকের ভিড় দেখে তার মনে সন্দেহ জাগে তার গাধা কি তাকে চিনতে পারবে! পাহারাদার তাকে বাধা দিল। সেও ঢুকবে পাহারাদারও ঢুকতে দেবে না।

বিচারক হৈচৈ শুনে হনীকে কাছে ডাকল। বিচারক বুঝতে পারল যে হনী একটু হাবা গোবা আছে।

অভীজ্ঞ ও প্রবীন বিচারক তার হাবভাব দেখে ভাবল একে নিশ্চয় কোন লোক তাকে অপদস্থ করাব ব্যবস্থা করেছে।

হনী যে সজ্ঞানে এসব কাজ করছে না তা বুঝতে বিচারকের বেশি সময় লাগল না।

ততক্ষণে হনী ওই মূলোগুলো বিচারককে দেখিয়ে বলতে লাগল, "আরে যতই হোক আমার গাধা আমার কাছে আসবে না? আমি নিজের হাতে ওই পাগড়ীতে একটা মুদ্রা পুরে রেখেছি।"

বিচারক শান্ত স্বরে বলল, "তুমি তোমার গাধাটাকে কত দিয়ে কিনেছিলে?"

হনী জানাল যে সে একটি মুদ্রা দিয়ে কিনেছিল।

বিচারক তৎক্ষণাৎ হনীর হাতে চারটি মুদ্রা দিয়ে তাকে বিদেয় করল।

বিচারকের কাছ থেকে চারটি মুদ্রা পেয়ে হনী মনে মনে ভাবল তার সমস্যা তো মিটে গেছে। সে আবার একটি গাধা আর এক বস্তা চাল নিয়ে নিজের বাড়ি পেঁছে গ্রাম প্রধানকে চালের বস্তা দিয়ে নিজের বাড়ি পেঁছাল।

তারপর থেকে সে কোনদিন গাধার মাথা নাড়া বিশ্বাস করেনি।

মহাভারত

শোকে দুঃখে ও দুর্ভাবনায় ধৃতরাষ্ট্র এক নিরালা জায়গায় বসেছিলেন। তিনি বসে তাঁর ছেলেদের দুর্ব্যবহারের কথা চিন্তা করছিলেন। ঠিক সেই সময়ে ভগবান ব্যাস তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি তার অবস্থা দেখে ধীরে ধীরে ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, "রাজা, তোমার দুর্মতি পুত্রদের এবং অন্যান্য রাজাদের মৃত্যুকাল অতি নিকটে। তাঁরা এই যুদ্ধে পরস্পরকে বিনষ্ট করবেন। কালের বশেই এরকম হচ্ছে এটা জানবে। কাজেই এজন্য তুমি কোন দুঃখ করো না। যদি তুমি এ যুদ্ধ নিজের চোখে দেখতে চাও তবে আমি তোমাকে দিব্যদৃষ্টি দান করব।"

উত্তরে ধৃতরাষ্ট্র ব্যাসদেবকে বললেন, "ব্রহ্মর্ষিশ্রেষ্ঠ, জ্ঞাতিবধ দেখার মত ইচ্ছে অতীতে কোনদিন আমার ছিল না এখনও আমার নেই, তবে আমি আপনার মুখে যুদ্ধের সমস্ত বিবরণ শুনতে চাই।"

ব্যাস বললেন, "গবল্গন পুত্র এই সঞ্জয় আমার বরে দিব্যচক্ষু লাভ করবেন। যুদ্ধের সমস্ত ঘটনা এঁর প্রত্যক্ষ হবে। সর্বজ্ঞ হয়ে ইনিই তোমাকে যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ শোনাবেন।" একথা বলে ব্যাস সেখান থেকে চলে গেলেন।

সঞ্জয় বক্তা এবং ধৃতরাষ্ট্র শ্রোতা—এই ভাবে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের সমস্ত ঘটনা মহাভারতে বিবৃত হয়েছে।

কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম সিংহনাদ করে শঙ্খ বাজালেন। তারপর ভেরী, পণব, আনক এবং আরও অনেক রণবাদ্য তুমুল শব্দে বেজে উঠল।

শস্ত্রসম্পাত আসন্ন জেনে অর্জুন তাঁর সারথি কৃষ্ণকে বললেন, "অচ্যুত, দুই সেনার মাঝখানে আমার রথ রাখ। তার পর কাদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে দেখে নিচ্ছি।"

কৃষ্ণ কুরুপাণ্ডব সেনাদের মধ্যে রথ নিয়ে গেলেন। দুই দলেই পিতা ও পিতামহ স্থানীয় গুরুজন, আচার্য, শ্বশুর, ভ্রাতা, পুত্র ও সুহৃদগণ আছেন দেখতে পেলেন। এই সব দেখে অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন, "হে মাধব, এই সকল যুদ্ধার্থী আত্মীয়স্বজনকে দেখে আমার সমস্ত দেহ শিথিল ও অবসন্ন হয়ে আসছে। সমস্ত শরীর আমার কাঁপছে, গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, হাত থেকে গাণ্ডীব পড়ে যাচ্ছে। আমার সমস্ত শক্তি লোপ পেয়ে যাচ্ছে। আমি এতজনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে অজস্র মানুষের রক্তে মাটি ভিজিয়ে জয়ী হতে চাই না, যাদের জন্য লোকে যুদ্ধ করে, সুখ কামনা করে তাঁরাই আজ যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দিতে এসেছেন। সমস্ত আত্মীয়, বন্ধুগণ বধ করে আমাদের কি সুখ হবে? না আমরা শান্তি পাব। আমরা যে রাজ্যের লোভে মহাপাপ করতে যাচ্ছি। যদি কৌরবগণ নিরস্ত্র অবস্থায় আমাকে বধ করে তাও আমি মাথা পেতে গ্রহণ করব।" কাতর কণ্ঠে এই কথা বলে অর্জুন ধনুর্বান ত্যাগ করে রথের মধ্যে শিথিল ও অবসন্ন বদনে বসে পড়লেন।

অর্জুনকে বিপদে ভেঙ্গে পড়তে দেখে কৃষ্ণ বললেন, "এই বিপদের সময়ে তুমি মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছ কেন? ক্লীবের ন্যায় কথা বলো না। সামান্য দুর্বলতাও ত্যাগ করতে হবে তোমাকে। দেহধারী আত্মার যেমন এই দেহে কৌমার যৌবন জরা হয় সেইরূপ দেহান্তর প্রাপ্তি ঘটে। ধীর ব্যক্তি তাতে মোহগ্রস্ত হন না। যাঁর দ্বারা

এই সমস্ত বিশ্ব তাঁকে অবিনাশী জেনো। কেউ এই অব্যয়ের বিনাশ করতে পারেনা। যে জন্মেছে তার মৃত্যু নিশ্চয় হবে, এবং মৃত ব্যক্তি নিশ্চয় পুনর্বার জন্মাবে। অতএব এই অপরিহার্য বিষয়ে তুমি শোক করতে পার না। আর তোমার নিজের ধর্ম বিচার করেও, তুমি বিকম্পিত হতে পার না। কারণ ধর্মযুদ্ধ ছাড়া ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্রেয় কিছু নেই। উন্মুক্ত স্বর্গদ্বার আপনা থেকেই উপস্থিত। সুখী ক্ষত্রিয়রাই এরকম যুদ্ধ লাভ করে থাকেন। এখন তুমি যদি এ ধর্মযুদ্ধ না কর তাহলে তুমি নিজের ধর্ম ও যশ হারিয়ে ফেলবে এবং পাপগ্রস্ত হবে। এ যুদ্ধে যদি তুমি নিহত হও তাহলে স্বর্গলাভ করবে। আর যদি জয়-লাভ কর তবে পৃথিবীর রাজ্য ভোগ করবে। এভাবে ভেঙ্গে পড়া তোমার ধর্ম নয়। ওঠ, যশোলাভ করে, শত্রুদের জয় করে পৃথিবীর রাজ্য ভোগ কর।"

অর্জুন বললেন, "হে কৃষ্ণ, আমার মোহ ও দুর্বলতা কেটে গেছে। তোমার কথায় ও উপদেশে আমি ধর্মজ্ঞান লাভ করেছি। আমার দ্বিধা সন্দেহ দূর হয়েছে। তোমার আদেশই আমি পালন করব।"

যুধিষ্ঠির দেখতে পেলেন, উভয় দলের বিরাট সৈন্যবাহিনী যেন সাগরের সমতুল্য। বন্যার জলের মত ধাবিত হচ্ছে। সমুদ্রের মত গর্জন করছে। প্রত্যেকেরই আচরণে বিক্ষুব্ধ ভাব। চাল চলনে তীব্র গতি ও প্রচণ্ড শক্তি। যুদ্ধের জন্য উভয় দলই অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তিনি তাঁর দেহ থেকে বর্ম খুলে ফেলে অস্ত্র ত্যাগ করে তাড়াতাড়ি রথ থেকে নামলেন এবং শত্রু সৈন্যদলের ভেতর দিয়ে করজোড়ে পায়ে হেঁটে এগোতে লাগলেন। এভাবে তিনি ভীষ্মের কাছে এগিয়ে যেতে লাগলেন।

তাঁকে হঠাৎ এভাবে যেতে দেখে তাঁর সকল ভ্রাতারা ও কৃষ্ণ এবং প্রধান প্রধান রাজারা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁর অনুসরণ করলেন।

ভীম ও অর্জুনাদি তাঁকে তাঁর কি উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করলেন। কেন তিনি তাঁদের ত্যাগ করে নিরস্ত্র হয়ে একা শত্রু দলের ভেতরে এগিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির কোন উত্তর দিলেন না। এগিয়ে যেতে লাগলেন।

তখন কৃষ্ণ মৃদু হেসে তাদের বললেন, আমি জানি এঁর কি উদ্দেশ্য। ইনি ভীষ্ম-দ্রোণাদি সকল গুরুজনদের প্রতি তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধাভক্তি ও সম্মান দেখাবেন। তার পর শত্রুদলের সাথে যুদ্ধ করবেন। শাস্ত্রেও আছে গুরুজনদের সম্মান দেখিয়ে যুদ্ধ করলে জয়লাভ হবেই। আমিও তাই মনে করি।

যুধিষ্ঠিরকে এভাবে আসতে দেখে দুর্যোধনের সৈন্যরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল এই পাপিষ্ঠ ভয় পেয়েছে। তাই ভাইদের সাথে এবং পিতামহ ভীষ্মের শরণাপন্ন হতে আসছে। ভীম ও অর্জুন থাকতে যুধিষ্ঠির ভয় পেল কেন? নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয় বংশে এর জন্ম হয়নি। এই ধরণের নানা কথা আলোচনা করতে করতে মনের আনন্দে তারা তাদের উত্তরীও নাড়তে লাগল।

যুধিষ্ঠির ধীর পদে এগিয়ে ভীষ্মের কাছে এসে তাঁর দুই পা ধরে বললেন, "পিতামহ, আমরা আমন্ত্রণ করছি আপ-নাকে, আপনার সাথে আমরা যুদ্ধ করব। আপনি অনুমতি দিন, আমাদের আশীর্বাদ করুন।"

ভীষ্ম বললেন, "মহারাজ, এভাবে যদি আমার কাছে না আসতে, তাহলে পরা-জয়ের জন্য তোমাকে আমি অভিশাপ দিতাম। আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি পাণ্ডুপুত্র, তুমি যুদ্ধ কর, যুদ্ধে জয়লাভ করে তোমার আর যা ইচ্ছে তাও লাভ কর। অর্থ কারও দাস নয়, মানুষই অর্থের দাস। দুর্যোধনরা আমাকে অর্থ দিয়েই বেঁধে রেখেছে। তাই ক্লীবের মতই একান্তভাবে নিরুপায় হয়েই বলছি তোমাকে, আমি পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিয়ে দুর্যোধনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারি
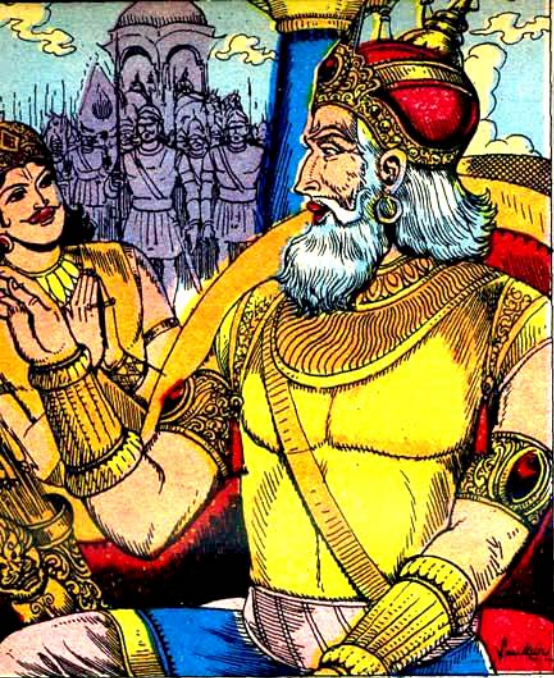
না। এ ছাড়া তুমি আর কি আশা করছ বল?"

যুধিষ্ঠির বললেন, "মহাজ্ঞানী পিতামহ, আমার মঙ্গলের জন্য আপনি আমাকে সৎ পরামর্শ দিন এবং আপনি কৌরবদের জন্য যুদ্ধ করুন। এটাই আপনার কাছে আমার একমাত্র প্রার্থনা।"

ভীষ্ম বললেন, "আমি তো তোমার শত্রুদলের পক্ষেই যুদ্ধ করব। তুমি আমার কাছে কিভাবে সাহায্য চাও?"

যুধিষ্ঠির বললেন, "পিতামহ, আপনি অজেয়, যদি আমার মঙ্গল কামনা করেন তবে বলুন আপনাকে আমরা কি উপায়ে জয় করব?"

ভীষ্ম বললেন, "কৌন্তেয়, যুদ্ধে আমাকে পরাজিত করতে পারে এমন পুরুষ নেই। আমার মৃত্যুর সময়ও এখন নয়। পরে তুমি আবার আমার কাছে এসো।"

যুধিষ্ঠির ভীষ্মের কাছে বিদায় নিয়ে দ্রোণাচার্যের কাছে গেলেন। তাঁকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে বললেন, "হে ভগবান, আপনাকে আমন্ত্রণ করছি, আমি নিষ্পাপ হয়ে যুদ্ধ করব। আর কোন উপায়ে শত্রু জয় করতে পারব তা বলে দিন।"

দ্রোণাচার্যও ভীষ্মের মতই যুধিষ্ঠিরকে বললেন, "এ সময়ে বিশেষ করে যুদ্ধের পূর্ব মুহূর্তে যদি তুমি আমার কাছে না আসতে তবে আমি তোমাকে অভিশাপ দিতাম। তিনি আরও বললেন, মানুষ অর্থের দাস, অর্থ কারও দাস নয়। কৌরবরা আমাকে অর্থের দ্বারাই বেঁধে রেখেছে। সে কারণে আমি ক্লীবের মতই তোমাকে নিরূপায় ও কর্তব্যের প্রতি অনুরক্ত হয়ে বলছি, আমি কৌরবদের পক্ষে তাদের জন্যই যুদ্ধ করব। কিন্তু আমি মনেপ্রাণে তোমায় শুভ এবং বিজয় কামণায় আশীর্বাদ করছি। মনে রেখ, যেখানে ধর্ম সেখানেই কৃষ্ণ, যেখানে কৃষ্ণ সেখানেই জয়। তুমি যুদ্ধ কর। জয় তোমার হবেই। আরও কিছু যদি আমাকে তোমার বলার থাকে তো বল।"

যুধিষ্ঠির আবার বললেন, "দ্বিজশ্রেষ্ঠ, আপনি অপরাজেয়, কিভাবে আপনাকে আমরা জয় করব ?"

দ্রোণ বললেন, "হে বৎস, আমি যখন রথারোহণ অবস্থায় শরনিক্ষেপ করি তখন আমাকে বধ করতে পারে এমন লোক নেই। যদি আমি অস্ত্র ত্যাগ করে অচেতনপ্রায় হয়ে মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকি তবেই আমাকে বধ করা সহজ হবে। আর যদি কোন বিশ্বস্ত লোক আমাকে অত্যন্ত অপ্রিয় সংবাদ দেয় তবেই আমি যুদ্ধকালে অস্ত্র ত্যাগ করি। এই অতি সত্য তোমাকে বললাম।"

এরপর যুধিষ্ঠির কৃপাচার্যের নিকটে গেলেন। তিনিও ভীষ্ম ও দ্রোণের মতই একটু ভেবে নিজের পরাধীনতার কথা জানালেন এবং তাঁকে বললেন, "মহারাজ, আমি অবধ্য তবুও আমি আশীর্বাদ করছি তুমি যুদ্ধ করে জয়ী হও। তোমার এই আগমনে আমি যারপরনাই সন্তুষ্ট হয়েছি। অতি সত্য কথা বলছি যে আমি প্রত্যহ ঘুম থেকে উঠে তোমার জয় কামনা করব।"

তারপর যুধিষ্ঠির শল্যের কাছে গেলেন। তাঁকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করলেন।

শল্যও বললেন, "তোমার এই সম্মান প্রদর্শনে আমি খুব আনন্দিত হয়েছি। তুমি এ সময়ে না এলে আমি শাপ দিতাম। দুর্যোধনদের অধীন আমি। তোমাকে কি ভাবে সাহায্য করব বল।"
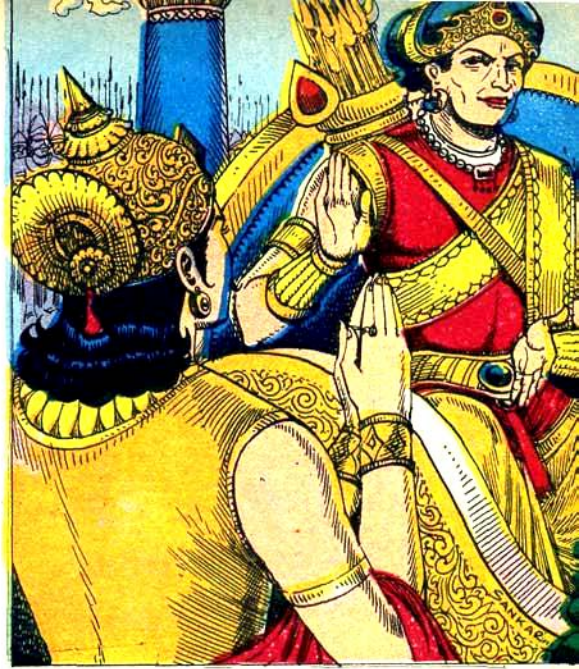
যুধিষ্ঠির বললেন, "পূর্বে আপনি বর দিয়েছিলেন যে যুদ্ধ সময়ে সূতপুত্রের তেজ নষ্ট করবেন। সেই বরই আমার কাম্য।"

শল্য বললেন, "কুন্তীপুত্র, তোমার কামণা পূর্ণ হবে। যুদ্ধ কর তুমি। নিশ্চয়ই তুমি জয়লাভ করবে।"

যুধিষ্ঠির এইভাবে সকল গুরুজনদের সঙ্গে দেখা করে তাদের আশীর্বাদ নিয়ে প্রসন্ন হৃদয়ে অগ্রসর হলেন।

শত্রুপক্ষের বিরাট সৈন্যদলের ভেতর থেকে যুধিষ্ঠির বেরিয়ে ভীম অর্জুন ভাই-দের সাথে মিলিত হয়ে ফিরে গেলেন।

কৃষ্ণ সে সময়ে কর্ণের কাছে গিয়ে বললেন, "শুনেছি রাগ, বিদ্বেষ বশতঃ তুমি ভীষ্মের উপস্থিতিতে যুদ্ধ করবে না। যতদিন ভীষ্ম বেঁচে থাকবে ততদিন তুমি আমাদের পক্ষেই থাক। তাঁর মৃত্যুর পর যদি দুর্যোধনকে সাহায্য করা কর্তব্য মনে কর তখন আবার কৌরবদলে যোগ দিয়ো।"

কর্ণ বললেন, "হে কেশব, আমি দুর্যোধনের অপ্রিয় হতে যাব না। এটুকু জেনে রাখ, তাঁর শুভাকাঙ্খী আমি। তাঁর জন্য আমি নিজের প্রাণ বিসর্জন দেব।"

এরপর কৃষ্ণ পাণ্ডবদের কাছে ফিরে গেলেন। যুধিষ্ঠির উচ্চকণ্ঠে কৌরব সেনাদের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন, "আমাদের যিনি সাহায্য করতে চান তাঁকে আমি সাদরে বরণ করে নেব। যুধিষ্ঠিরের এই কথা শুনে যুযুৎসু বললেন, "যদি আমাকে নেন তবে আমি কৌরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।"

তার কথা শুনে উৎফুল্ল মনে যুধিষ্ঠির বললেন, "এস যুযুৎসু, আমরা সকলে একত্রে তোমার দুর্মতি ভাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। বাসুদেব ও আমরা একযোগে তোমাকে সানন্দে গ্রহণ করছি। তোমার ভাইদের মধ্যে একমাত্র তুমিই ধৃতরাষ্ট্রের বংশের মান রাখবে।"

এই কথা শোনার পর ভাইদের ত্যাগ করে যুযুৎসু দুন্দুভি বাজিয়ে কৌরবদের পরিত্যাগ কয়ে পাণ্ডব পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

যুধিষ্ঠিরাদি সকলে পুনরায় বর্ম ধারণ করে রথে আরোহণ করলেন। এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন।

রণবাদ্য বেজে উঠল। বীর যোদ্ধারা সিংহনাদ করলেন।

পাণ্ডবগণ গুরুজনদের সম্মানিত করেছেন দেখে আর্য ও ম্লেচ্ছ সকলেই গদ্গদ কণ্ঠে তাঁদের প্রশংসা করতে লাগলেন।

মিত্র-ভেদ

দুই

করটকের কাছে বাঁদরের কাহিনী শুনে দমনক বলল ঃ "দাদা, যারা শুধু নিজের স্বার্থের কথা ভাবে, শুধু নিজের পেট ভরানোর কথা চিন্তা করে, তারা কোন দিন উন্নতি করতে পারে না। জীবন যে কি জিনিস তা বুঝতে পারে না। ঠোঁটে যা ঠেকে তাই খায় কাক। পেট ভর্তি করে তা' দিয়ে। যে জীবন বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি কারও কাজে লাগে না তার সার্থকতা কোথায়! একটা হাড়ের টুকরো পেলেও কুকুর সন্তুষ্ট হয়। কিন্তু হাতীর নিজস্ব অভিমান আছে। যা' তা' জিনিস খায় না। সিংহের খাবার মধ্যে চামচিকে পড়লে সে কি আর তা' খায়? অন্য প্রাণীকে মারার ব্যাপারেও প্রকৃতি জগতের একটা নিয়ম আছে। একটা ধর্ম আছে। ছোট গর্ত তাড়াতাড়ি ভরে যায়। ঠিক তেমনি হীন ব্যক্তি অল্পেই সন্তুষ্ট হয়ে যায়। যে অভিজাত সে তা' করে না।"

"কিন্তু এ দিয়ে কর্তব্যের সমাধান কি হলো? আমরা তো সিংহের অধীনে কাজ করছি না?" করটক বলল।

"পাগল! পদ বা চাকরি আজ আছে কাল নেই। কিন্তু কর্তব্য থাকে সারা জীবন। যোগ্য ব্যক্তি বহু কাল একই পদে থাকতে পারে। অযোগ্য যে সে বেশিদিন থাকতে পারে না। আমরা যোগ্যতার সাথে কাজ করলে আদর পাব,

শেষ প্রচ্ছদ চিত্র

কিছু করছেন বলে মনে হচ্ছে না।" দমনক বলল।

"সিংহের কাছে গিয়ে কে বলবে যে আপনি ভয় পেয়েছেন? তুমি এসব ঝামেলায় যেও না।" এসব কথা বলে করটক পরামর্শ দিল।

"যে সাহসী তার বিপদের ভয় থাকে না। যা' সত্য তা' অপ্রিয় হলেও, এবং তাতে যদি রাজার উপকার হয়, তা' বলা কর্তব্য। এ না করাই হচ্ছে কর্তব্য থেকে সরে যাওয়া।" বিশেষ ভঙ্গিমায় মাথা নাড়তে নাড়তে দমনক বলল।

"ভাল কথা। তবে খুব সাবধান। তোমার কাজের উপর নির্ভর করছে আমাদের দুজনের জীবন।" করটক জবাবে বলল।

না হলে পাব না। বিরাট একটা পাথর উপরে তোলা খুব কঠিন কিন্তু উপর থেকে একটা পাথর ফেলে দেওয়া খুব সোজা। ঠিক তেমনি প্রতিষ্ঠা পাওয়া খুব শক্ত। শুধু পেট ভরানোর জন্যে কোন কাজ করা আমার অপছন্দ।" দমনক বলল।

"খুব ভাল কথা। এবার আসল কথাটা বল দেখি। আমাদের সিংহ প্রভুকে তুমি কি জিজ্ঞেস করতে চাইছ আর কোন প্রয়োজনে?" করটক বলল।

"আমার মনে হচ্ছে আমাদের প্রভু কোন কিছুতে ভয় পেয়েছেন। তাঁকে দেখে অন্য জন্তুগুলোও ভীষণ ভয় পেয়েছে। এই ভয় দূর করার জন্য আমাদের প্রভু কিছু করছেন বলে মনে হচ্ছে না।"

তারপর দমনক দাদাকে প্রণাম করে পিঙ্গলকের কাছে গেল। পিঙ্গলক দমনককে দেখে নিজের অনুচরকে বলল, "ওকে আমার কাছে আসতে দাও। ও আমার পুরোনো সেবকের পুত্র।" দমনক পিঙ্গলকের কাছে এসে প্রণাম করে বসল।

"তুমি ভাল আছ? অনেকদিন তোমাকে দেখতে পাইনি তো? কোন কাজে এসেছ আমার কাছে? পিঙ্গলক জিজ্ঞেস করল।

"আপনি আমার খোঁজ নিন অথবা না নিন, কর্তব্যের তাগিদে আপনার কাছে

আমাকে আসতেই হবে। আমার মত ক্ষুদ্রের কাছ থেকেও আপনার কিছু উপকার হতে পারে। কয়েক পুরুষ ধরে আমরা আপনার সেবা করে আসছি। আপনি বললেন, 'অনেকদিন তোমাকে দেখতে পাইনি তো?' দেখবেন কোত্থেকে? আপনি তো আর আমাকে মন্ত্রীমণ্ডলীতে রাখেন নি! কোন পরামর্শ চাইতেও ডেকে পাঠাননি কোনদিন। কে যে যোগ্য আর কে যে অযোগ্য তার বিচার হয়নি। ঘোড়া, বই, তরবারি, মেয়েছেলে, বাদ্য এবং কথার দাম এসব যে ব্যবহার করে একমাত্র তার উপরেই নির্ভর করে।" দমনক আশাতীত সুযোগ পেয়ে মনের কথাগুলো যেন গুছিয়ে বলল।

"শেয়াল, তুমি কি বলতে চাইছ বল।" পিঙ্গলক বলল।

"আমি শেয়াল হতে পারি, তাই বলে আমাকে অত ছোট ভাববেন না। জানেন তো উত্তম শ্রেণীর রেশম বেরোয় একটা ছোট্ট পোকা থেকে। পাথরের খনি থেকে বেরোয় সোনা। কাঠের ঘর্ষনে সৃষ্টি হয় আগুনের। অতএব কোথায় জন্ম সেটা বড় কথা নয়, বড় হল গুণ। আপনি দয়া করে আমাকে অতটা উপেক্ষা করবেন না। আমি আপনার বিশ্বস্ত প্রজা।" দমনক বলল।

"অত কথা কিসের? তুমি যে কি তা' কি আমি জানি না? আজ কেন এলে সেটা বল।" পিঙ্গলক বলল।

"আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই। আপনি নদীতে জল খেতে গিয়ে, জল না খেয়ে কেন তৎক্ষণাৎ ফিরে এলেন।" এতক্ষণ পরে বুকে সাহস সঞ্চয় করে দমনক দৃঢ়তার সঙ্গে জিজ্ঞেস করল।

পিঙ্গলক ভাবল তার ভয় পাওয়ার কথা দমনকের কাছে প্রকাশ করা উচিত হবে না। তাই সে মনের ভাব গোপন করে দমনককে বলল, "তেমন কোন কারণ নেই। জল খেতে ইচ্ছে করল না, তাই ফিরে এলাম।"

"না বলতে চান বলবেন না। সব কথা সব সময় সবাইকে যে বলতে হবে তার কি মানে আছে।" দমনক বলল।

দমনকের সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে তাকে বিশ্বাস করে পিঙ্গলক বলল, "আমাদের বনে এক অদ্ভুত ধরণের জানোয়ার এসেছে। তোমাকে বিশ্বাস করে বলছি অন্য কানে যেন না যায়। ভাবছি আমি এই জঙ্গল ছেড়ে দেব কি না!"

"ভয়ঙ্কর শব্দ শুনেই কি মহারাজ ভয় পেয়ে গেলেন? আর সেইজন্য আপনি পূর্বপুরুষদের অর্জিত রাজ্য ছেড়ে পালানোর কথা ভাবছেন? এ কি ন্যায়সঙ্গত কাজ? বিদ্যুৎ চমকানোর পরে মেঘগর্জন হয়। ঝড়েরও একটা ভয়ঙ্কর শব্দ আছে। আপনি নিছক শব্দে এত ভয় পাবেন না। আপনি কি রণদুন্দুভির কাহিনী শোনেন নি?" দমনক অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে পিঙ্গলককে জিজ্ঞেস করল।

"না তো! কি সেটা?" পিঙ্গলক জিজ্ঞেস করল।

দমনক বলল, "এক ক্ষুধার্ত শেয়াল খাদ্যের খোঁজে যুদ্ধ ভূমিতে গিয়েছিল। সেখানে সে এক ভয়ঙ্কর শব্দ শুনতে পেল। তা' শুনে শেয়াল খুব ভয় পেল। লক্ষ্য করতে লাগল কোত্থেকে আওয়াজ আসছে। দেখতে পেল একটি বড় গাছের সঙ্গে রণদুন্দুভি বাঁধা আছে। বাতাসের ফলে গাছের ডাল ঐ দুন্দুভির গায়ে লাগছে, ফলে ঐ আওয়াজ হচ্ছে। শেয়াল ভাবল, ওর ভেতরে মাংস আছে। শেয়াল দুন্দুভির চামড়া ছিঁড়ে দেখে ওর ভেতরটা ফাঁকা।"

দমনক এই কাহিনী শুনিয়ে পিঙ্গলককে বলল, "তাই বলছি, শুধু শব্দ শুনে দূর থেকে কিছু ভেবে নেওয়া ঠিক নয়। এবং সেই ভাবনার উপর সিদ্ধান্ত নেওয়া অনুচিত।"

যীশুর জন্মস্থান

বেতেল্‌হেমে (জর্ডনে) স্থিত এই গির্জায় যীশু খৃষ্টের জন্ম হয়। এর থামে ও দেয়ালে প্রাচীন খৃষ্টীয় স্থাপত্য ভাস্কর্যের নিদর্শন রয়েছে। কয়েকশো বছর অতিক্রান্ত,হলেও আজও তা অক্ষুন্ন রয়েছে।

ফটো : পি. জয়রাজ
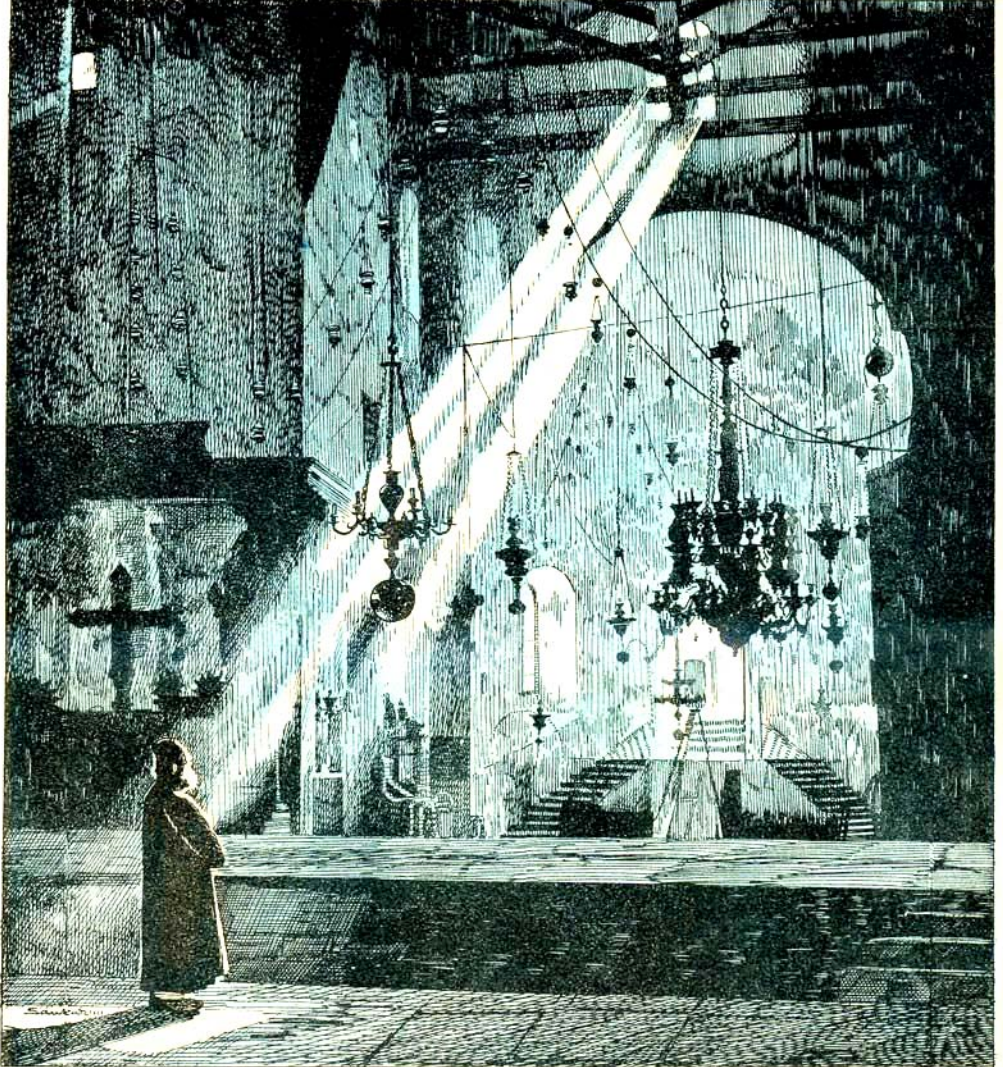
পুরস্কৃত
নাম

ভয় দেখানোর ছলে

পুরস্কার পেলেন
তরুণ ভট্টাচার্য

ফটো ঃ পি. সুন্দরম্

গুরুধাম, মধুবন
কালনা, বর্ধমান

বিস্ময়ে চোখ জ্বলে

পুরস্কৃত
নাম

ফটো নামকরণ প্রতিযোগিতা ঃঃ পুরস্কার ২০ টাকা

* ফটো-নামকরণ ২০শে অক্টোবর '৭৩-এর মধ্যে পৌছানো চাই।
* ফটোর নামকরণ দু চারটি শব্দের মধ্যে হওয়া চাই এবং দুটো ফটোর নামকরণের মধ্যে ছন্দগত মিল থাকা চাই। নিচের ঠিকানায় পোস্ট-কার্ডেই লিখে পাঠাতে হবে। পুরস্কৃত নাম সহ বড় ফটো ডিসেম্বর '৭৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

চাঁদমামা

এই সংখ্যার কয়েকটি গল্প-সম্ভার

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ চিত্র

চেঙ্গিস খাঁ

তৃতীয় প্রচ্ছদ চিত্র

শিবাজী

Printed by B. V. REDDI at The Prasad Process Private Ltd., and Published by B. VISWANATHA REDDI for Chandamama Publications, 2 & 3, Arcot Road, Madras-26. Controlling Editor: 'CHAKRAPANI'

চিক্‌লেট্‌স®
এখন পাবে ৪টি
চিক্‌লেটের প্যাকেও
২৫ প.
4 PIECES
Chiclets
4 PIECES
Chiclets
4 PIECES
Chiclets
4 PIECES
4 PIECES
Chiclets
4 PIECES
Chiclets
4 PIECES
Chiclets
4 PIECES
হাঁ, চিক্‌লেট্‌স এখন পাওয়া যাচ্ছে ৪টি পেলেটের প্যাকে—
দাম মাত্র ২৫ পয়সা। নতুন নতুন প্যাকে চ্যুইং গাম আরও মজার।
৪ পেলেটের নতুন প্যাকে পাবে তোমাদের পছন্দমত
পিপারমেন্ট, অরেঞ্জ, টুটি-ফ্রুটি ও পাইন অ্যাপেলের স্বাদগন্ধে।
চিক্‌লেট্‌স মজার চ্যুইং গাম ভিটামিন 'এ'+'ডি' আর ক্যালসিয়াম-সমৃদ্ধ।
WH. 6452
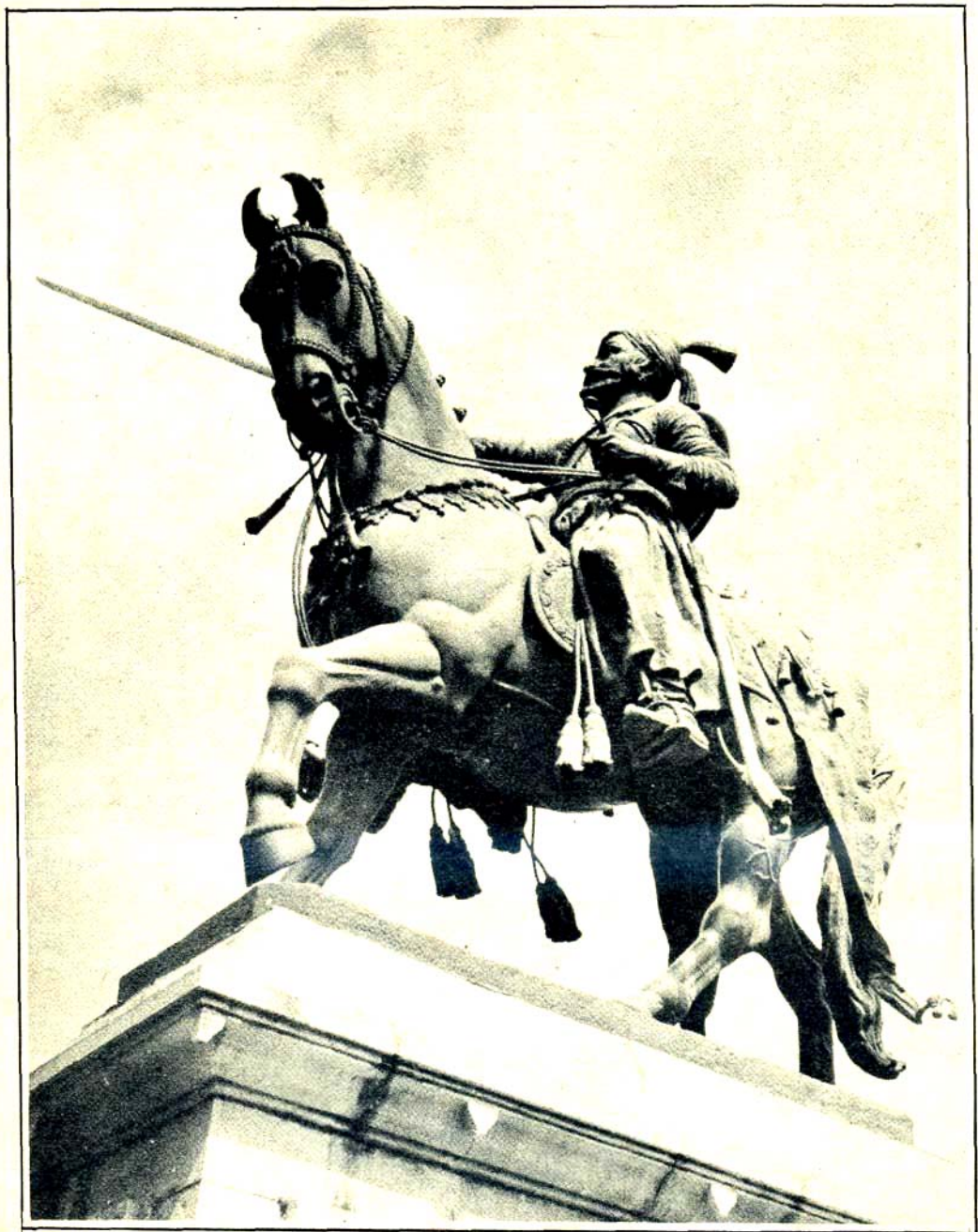
Photo by: **SHANTARAM R. SHINDE**

মিত্রভেদ